অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো

দীপেন ভট্টাচার্য

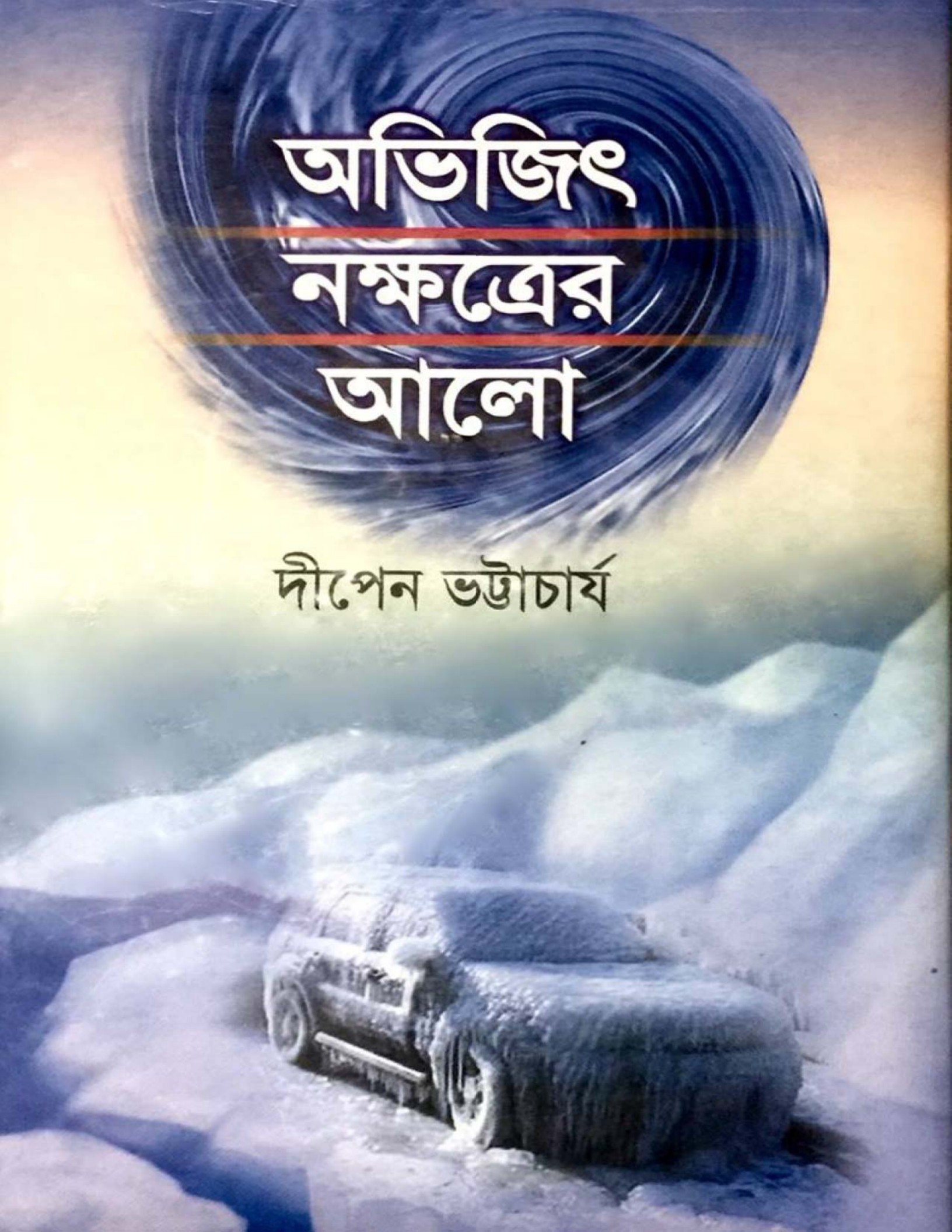

অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো

দীপেন ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

মাকে—

বর্তমানের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই,
সময়ের বাস ছিল অতীতে।
আমাদের জীবন হচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের
এক বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ স্মৃতি বা প্রতিফলন।

হোর্হে লুই বোর্হেস

শুরুতে

১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে আমাকে একটা কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে যেতে হয়েছিল। সেখানে সান ফ্রানসিস্কো শহরের উপকণ্ঠে অনীক চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অনীক চৌধুরী ঠিক কী কাজ করতেন সেটা আমি আমার দু বছর ক্যালিফোর্নিয়া বাসকালে বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু তার মধ্যে এমন এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করত যা তাকে কোন স্থায়ী পেশায় নিশ্চল করে রাখতে পারত বলে আমার মনে হয়নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ভক্ত ছিল অনীক, নিজেকে আরণ্যক বলে দাবি করত, আর সেটা প্রমাণ করার জন্যেই হয়ত মাঝে মধ্যে এক-দুই সপ্তাহের জন্যে উধাও হয়ে যেত, ফিরে এসে গল্প করত পাহাড়ে অরণ্যে অ্যাডভেঞ্চারের। আমার পাহাড়ে চড়ার সামান্য নেশা ছিল, তাই মাঝে মাঝে হাইকিং, ব্যাকপ্যাকিং ইত্যাদি অভিযানের মাধ্যমে আমার সংক্ষিপ্ত মার্কিন বসতকালে তার সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা সখ্য গড়ে ওঠে। আমি ঢাকায় ফিরে আসার আগে সে একদিন বাদামি চামড়ায় মোড়ানো একটি ডায়েরি নিয়ে আসে, বলে সেটা একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি যেটা সে ছাপাতে চায়। অনীক জানায় এটার একটা ইংরেজি অনুবাদ দরকার, কিন্তু তার হাতে আর সময় নেই, আপাতত বাংলায় যদি ছাপিয়ে দিতে পারি তবে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। মার্কিন দেশে অনীকের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, পরবর্তীকালে আরও দু-একবার আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছি তখনও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, সেখানকার পরিচিত কেউই তার হদিস দিতে পারেনি।

অনীক তার ডায়েরিতে নিজেকে আরণ্যক বলে অভিহিত করেছে, সংক্ষেপে লিখেছে আ.। এতদিন পরে তার লেখা যখন আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে তখন বলব সেই লেখার সত্যতা যাচাই করবার ভার আমার নয়, কেবল এটুকু বলব আরণ্যকের বা অনীকের কাহিনী আমাকে বিস্মিত করেছে, মহাবিশ্বের উদাসীনতার মাঝে জীবনের সংবেদনশীল সচেতনতা যেমন আমাকে বিস্মিত করে। সম্ভাব্যতার বিচারে মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের অস্তিত্ব যেমন এক বিরল কিন্তু সম্ভাব্য ঘটনা, আরণ্যকের কাহিনীও সেই রকম এক সম্ভবপর ঘটনা। আমি বলি শেষাবধি সবই সম্ভাব্য, মহা-মহাবিশ্বের অসীমতার মাঝে অসম্ভব বলে কী কিছু থাকতে পারে? এর পরে যা পড়বেন তা সবই অনীক, আরণ্যক বা আ.র লেখা। একেবারে শেষে আমি একটা ছোট পরিশিষ্ট যোগ করেছি মাত্র।

অমল, ২০০৬

দিন ০. কুইবেক

১৯৯১ সালে আমি ওয়াশিংটন ডিসি শহরের নিকটবর্তী ম্যারিল্যান্ড রাজ্যে কাজ করতাম। সে বছরের প্রথমদিকে ভিসা সংক্রান্ত কাজে আমাকে কানাডার কুইবেকে যেতে হয়েছিল। গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলাম, ম্যারিল্যান্ড থেকে কুইবেকে পৌঁছাতে প্রায় দু'দিন লেগেছিল। কুইবেক ফরাসিভাষী শহর, সেন্ট লরেন্স নদীর ধারে অবস্থিত। সঠিক উচ্চারণ সম্ভবত কেহবেক বা এইরকম একটা কিছু, আলগনকিন ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের ভাষায় যার অর্থ, 'এইখানে নদীটা সরু হয়ে যায়'। আর এখন ইংরেজ কানাডায় কুইবেক ফরাসি সংস্কৃতির রক্ষক। আমি সেখানে যাওয়ার পর এক বড় তুষার ঝড়ে সমস্ত শহর রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে পড়ে সেই তুষার ঝড়ের মধ্যাই এক তরুণী আমার কাছে কুইবেক শহরের গ্রে-হাউন্ড বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাইড চেয়েছিল। তাকে নামিয়ে দিয়ে, একটা দীর্ঘমেয়াদি গাড়ি রাখার জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, ছোট গলির রাস্তার ওপর খুবই ছোট ইউরোপীয় ধাঁচের একটা হোটেলে উঠি। মনে পড়ে ঐ হোটেলের ঘরে কোনো টেলিফোন বা টেলিভিশন ছিল না, দিন দুই শুধু সামনের ছাদের বরফে পরিষ্কার করা দেখা ছাড়া আমার করার কিছু ছিল না। তিন দিন পর বাইরে যাওয়ার রাস্তা খুললে আবার দক্ষিণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে রওনা দিলাম।

দিন ১. কুইবেক

পাহাড় পেরিয়েই তাকে দেখতে পেলাম। কালো পিচের রাস্তা ফিতের মতো শুয়ে আছে ফেব্রুয়ারির তুষারের মাঝে। তুষারের সাদায়, এক ছোট টিলার ঢালুতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমার গাড়ি ছাড়া রাস্তায় ছিল না অন্য কোনো কিছু। অনেক দূরে—ডানে ও বাঁয়ে—পাতাঝরা ম্যাপেলের বন, আর মাঝেমধ্যে ছোট ছোট বাড়ি যাদের চিমনির ঘন ধোঁয়া সাদা মেঘলা আকাশে শীতকে করে তুলেছিল আরও ঘনীভূত।

অনেক দূর থেকেই আমি তার তোলা হাত দেখতে পেলাম, সে চাইছে আমার গাড়ি থামাতে। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল সে একজন শ্বেতকায় তরুণ, রাস্তার পাশেই রাখা তার ব্যাগ। হিচ-হাইকারদের গাড়িতে তুলতে নিষেধ করে সবাই, যদিও দুদিন আগেই একজনকে কুইবেকের কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিয়েছি, এই ভাবতে ভাবতে গাড়ির গতি শ্লথ করে দিলাম। থামলাম সেই তরুণকে পার হয়ে। দৌড়ে এসে সে ডানদিকের দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, মের্সি। তার সাথে গড়িতে ঢোকে শীতল চাবুকের

মতো এক রাশ ঠাণ্ডা বাতাস। তার পরনে জিন্স, আধময়লা টি-শার্ট চামড়ার, রঙ ওঠা খয়েরি জ্যাকেট। নীল চোখ কোটরের গভীরে নিমজ্জিত। তীক্ষ্ণ থুতনির নিচে না-কামানো দুদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অগোছালো সোনালি চুল।

অনেক ধন্যবাদ, ব্যাগটা পেছনের সিটে রাখতে রাখতে আবার বলল সে ফরাসিতে। জা স্যু দে কাবেকয়াজ, আমি কুইবেক থেকে আসছি, এই বলে তার জমে-যাওয়া হাতদুটো ঘষে। যা ঠাণ্ডা! বলে সে আবার। গাড়ি ছেড়ে দিলাম। মন্ট্রিয়ল যাচ্ছ তুমি? সে জিজ্ঞেস করল। দু-হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বললাম, না, আমি যাচ্ছি আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রে। তোমাকে ড্রামন্ডভিলে নামিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়, সে বলল। তার ইংরেজি ছিল ভাঙা ভাঙা, অনেক কুইবেকবাসী কানাডীয়র যেমন হয়। তার নাম জানা গেল পীয়ের। পীয়ের যাচ্ছে মন্ট্রিয়ল, চাকরির খোঁজে।

তুমি কি আমেরিকায় কাজ করো? পীয়ের জিজ্ঞেস করে আমাকে। হ্যাঁ। এই গাড়ি কি তোমার? আবার বলি, হ্যাঁ। বাঃ, পীয়ের বলে তার ভাঙা ইংরেজিতে, গাড়ি আছে, কাজ কর, আর কি চাই? তোমার কি অবস্থা? প্রশ্ন করি আমি। সে বলে, ছ'মাস ধরে বেকার। হাইস্কুল শেষ করেছি, তবে কলেজে পড়ি নি। কারিগরি কোনো বিদ্যা আমার নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে, তারপর প্রায় আনমনা হয়ে বলে, আমি বিবাহিত ছিলাম। কিন্তু তার পরই যেন নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি বিবাহিত ছিলাম? আমি আশ্চর্য হয়ে পীয়েরের দিকে তাকাতেই দেখি বিস্ময়ে উদ্ভাসিত তার নীল চোখের মণি। আমি বিবাহিত ছিলাম, তৃতীয়বার বলে সে, কিন্তু আমি জানি না সেই বিয়ের কী হল!

ধীরে ধীরে বুঝলাম পীয়েরের মানসিক ভারসাম্য নেই। শঙ্কিত হলাম। তার জ্যাকেটের নিচে কোনো ছুরি লুকিয়ে নেই তো? হিচ-হাইকারদের গাড়িতে তোলার ব্যাপারে অনেক মার্কিন স্টেটে নিষেধাজ্ঞা আছে, কানাডায়ও নিশ্চয়ই তাই। ভালো করে ডান দিকে তাকিয়ে পীয়েরকে দেখে নিলাম, সে আমার থেকে কৃশকায়, চেহারায় একটা অভুক্ত ছাপ রয়েছে, আমাকে ছুরি দেখিয়ে নিশ্চয় খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না।

কিন্তু পীয়ের আমার গাড়িতে ওঠার আগে এই ঠাণ্ডায় কতক্ষণই-বা দাঁড়িয়ে ছিল? ছেঁড়া টি-শার্ট আর জ্যাকেটে কি ঠাণ্ডা মেনেছে? আর ওই জনশূন্য প্রান্তরেই-বা সে কেমন করে এল? এ'সব ভাবছি আর পীয়েরকে প্রশ্নগুলো করব করব করছি, এ'সময় পীয়ের আমাকে কিছু না বলেই গাড়ির রেডিও চালু করে দিল। এফ.এম. স্টেশনে দ্রুতলয়ে কোনো বাজনা বাজছিল। প্রথমে পীয়েরের প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হলেও রেডিওর বাজনা গাড়ির গতির সাথে

তাল মিলিয়ে আমার মনকে তুষারাবৃত কুইবেক রাজ্যকে পেছনে ফেলে যেতে সাহায্য করল।

দক্ষিণ-পশ্চিমের মেঘলা আকাশে অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য হেলে পড়ে দ্রুত, তার দুর্বল রশ্মি আমার চোখকে ধাঁধাতে পারে না। কিন্তু আমার অবাঞ্ছিত অতিথি তার চোখ বাঁচাতে সামনের কাচের পেছনে রাখা ভাইজর প্যাডটা নামিয়ে দেয়, তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কালো চশমা বের করে পরে, আমার দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো হাসে। একটা কালো চশমা মানুষের অবয়বকে বদলে দিতে পারে, কালো পর্দার পেছনে চোখ হারিয়ে পীয়ের হয়ে ওঠে রহস্যময় যাযাবর। উত্তর দ্রাঘিমার ম্লান শীতল আলোয় আরো অনেক হারিয়ে যাওয়া জিনিসের মতো পীয়েরের নির্দোষ হাসি আমার কাছে অবোধ্য থেকে যায়।

আমরা কথা বলি না, মৌন সঙ্গতায় মাইলের পর মাইল তুষার স্তূপ পেছনে পড়ে থাকে। সময়ের গতি ভবিষ্যতের দিকে, আমাদের জাগতিক পথকে সে নিয়ে যায় জানা ও অজানা এই দুয়ের মিশ্রিত ভবিষ্যতে, যে ভবিষ্যতে এই দুই আগন্তুকের দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দু-ঘণ্টা পরে পীয়েরকে ড্রামন্ডভিলে নামিয়ে দিয়ে আমি ভারমন্টের উদ্দেশে রওনা হই। গাড়ির রেডিয়েটরের গরমে শীতকে দূরে রাখি, তবে বুঝতে পারি বাইরে ঠাণ্ডা জমাট বাঁধছে। তারপর হঠাৎ, আমাকে কিছুটা চমকে দিয়ে সূর্য দিগন্তকে ছুঁয়ে দু-মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, মেঘ তর শেষ রশ্মিটা আড়াল করে রাখে। অন্ধকারের সাথে সাথে রাস্তায় ট্রাফিক হালকা হয়ে যায়, দু-একটা গাড়ি আমাকে পার হয়ে যায়; কিন্তু তারপর মনে হয় পৃথিবীর এক কোণে, এক জনশূন্য কালরাত্রিতে আমার যান্ত্রিক যান চলেছে কোনো অমোঘ লক্ষ্যের উদ্দেশে।

অন্ধকারে হালকা তুষার পড়তে আরম্ভ করে, গাড়ির হেডলাইট পেঁজা তুলোর মতো তুষারে প্রতিফলিত হয়ে রাতের হাইওয়েকে অপার্থিব করে দেয়। রাতে গাড়ি চালাতে আমি অভ্যস্ত, কিন্তু সময়ের সাথে তুষারপাতের মাত্রা বেড়ে চলে, এই অবস্থায় চালানো বিপজ্জনক। কিন্তু কোথায় থাকব? বর্ডারের আগে কোনো বড় লোকালয় নেই যে মোটেল পাওয়া যাবে। তাই যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা ভ্রমণের সময় যা করতাম, সেই পথেরই শরণাপন্ন হলাম। রাস্তার পাশে খুঁজতে লাগলাম একটা গ্রাম। নিকষ কালো অন্ধকার, সবাই শুয়ে পড়েছে। এই ক্ষুদ্র লোকালয় ছেড়ে একটু এগিয়েই পড়ল ছোট হ্রদ, হ্রদের পাশে কবরস্থান। গাড়ি কবরস্থানের ভেতরে ঢোকালাম, এখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। সুন্দর সাজানো ছিল কবরস্থান, তুষারে ঢেকে যাওয়া উঁচু-নিচু জায়গায় ছড়ানো-বাঁধানো কবর, গাড়ির হেডলাইট কবরের

ওপর মানানসই নামফলকগুলোকে উজ্জ্বল অস্তিত্ব দিল। কবরগুলো ছাড়িয়ে দূরে বরফ-জমাট হ্রদ। একটু ভেতরে, নিচের কবরগুলোর ওপর সান্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে এক কোণে জটলা পাকিয়ে ছিল কিছু বার্চগাছ, তাদের মাঝখানে গিয়ে গাড়ি থামালাম। তুষার পড়ছে, এখন স্লিপিং ব্যাগ বের করে বাইরে শুতে পারব না। সামনের সিটটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে স্লিপিং ব্যাগটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। কবরখানায় শুতে আমি অভ্যস্ত, মাটির নিচে যারা আছে তারা আমাকে কোনোদিন বিরক্ত করেনি।

দিন ২. বর্ডার

কিন্তু আমার মনে পড়ে সেই রাতে আমার ভালো ঘুম হয় নি। আকাশের তুষার মাটিতে পতনের সময় শব্দ করে না, তুষারের নরম শরীর পৃথিবীর সব শব্দ-সঞ্চালন শোষণ করে নেয় এক নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়, শুধু গাড়ির ছাদে রয়ে যায় তুষারপাতের মৃদু যান্ত্রিক কম্পন। ঠাণ্ডায় আধো ঘুম জাগরণে মনে হয় কেটে যায় অনেক সময়, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। গাড়ির দু'দিকের দুটো জানালায় দুটো মুখাবয়ব। অন্ধকার অবয়ব, কোনোকিছুই স্পষ্ট নয়, শুধু জ্যাকেটের ওপরের হুড মাথার উপবৃত্তাকার গঠনটি ধরে রেখেছে। আমি চিৎকার করতে চাই, কিন্তু অনেক স্বপ্নের মাঝে যা হয়—আমার গলা দিয়ে একটা অস্পষ্ট ঘর্ঘর স্বর বের হয় যা কিনা শুধু আমার কানেই আসে। তারপর মুখদুটো ধীরে ধীরে পেছনে সরতে থাকে, সরতে সরতে আধো-অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। মাথা উঁচু করে দেখি নিচের তুষার থেকে একটা ক্ষীণ প্রতিফলিত, কিন্তু বিচ্ছুরিত আলোতে, বার্চগাছের সাদা সরু দেহগুলো মনে হয় প্রাণ পেয়ে জ্বলছে। কিন্তু কোনো মানুষকে আমি দেখি না, রাতের আগন্তুকরা মিলিয়ে গেছে বার্চের শুভ্র শীতলতায়।

সকালে সূর্য ওঠার আগেই কোনো কারণে ঘুম ভাঙল, দেখলাম উত্তর-পূর্ব আকাশ সূর্যের প্রতীক্ষায় আবছা লাল আভায় ভরে গেছে। রাতে অনেক স্বপ্ন দেখেছি, তবে সে'সব স্বপ্ন দিনের আলোর সাথে দ্রুত অপসৃত হতে থাকে, তবু কিছু স্বপ্ন স্মৃতির কোণে ভেসে থাকে; কিন্তু তারা কি সবই স্বপ্ন? বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রণ থেকে তুষার রাত্রিকে বুঝতে চাই, যে মুখ দুটো আমি দেখেছি সেটা কি স্বপ্ন ছিল? স্বপ্নই ছিল বোধহয় ভাবি, কিন্তু সেই স্বপ্ন ছাড়াও আর একটা ঘটনা আমার আবছা মনে পড়ে। আর একটা স্বপ্ন দেখেছি যেখানে আমি ছিলাম এক রেডিও অপারেটর, বনের মধ্যে ছোট্ট এক কেবিনে। আমার কাছে কোনো এক বার্তা আসছে; কিন্তু আমি সেই বার্তার ভাষা বুঝছি না। বুঝতে পারছি বার্তা প্রেরক কোনো ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন, এক অচেনা ভাষার উচ্চারণে সনাক্ত করতে পারি ভীষণ আকুলতা। আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না, এক গভীর অসহায়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। কেবিনের বাইরে সবুজ বনে বৃষ্টি পড়ে, উঁচু গাছ আর মেঘ সূর্যকে আড়াল করে রাখে। অবশেষে আমার বেতার-যন্ত্র থেকে শুধু কৃত্রিম ইলেকট্রনিক শব্দ বের হয়, সেই ভয়ার্ত বিদেশীকে হারিয়ে ফেলি। মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে চিৎকার করতে থাকি, হ্যালো, হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? বেতার তরঙ্গে কোনো উত্তর আসে না। ছোট্ট কেবিনের জানালা দিয়ে দেখি বাইরে প্রকৃতির প্রাচীনতা, সহস্র বছর বয়সের উঁচু গাছের গুঁড়িতে ছড়ানো সবুজ শ্যাওলা, বৃষ্টিতে ভেজা। তারপর বৃষ্টির ফোঁটা কেবিনের ছাদের কাঠের ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের মেঝেতে পড়তে থাকে, আমি সেই ফোঁটার শব্দ শুনি—টপ,

টপ। টপ, টপ, টপ—শব্দ হতে থাকে।

টক, টক, টক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। গাড়ির জানালায় কেউ টোকা দিচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম, পুলিশ আসেনি তো? কবরস্থানে আইনত রাতে থাকা মানা। কিন্তু পুলিশের বদলে দেখলাম পীয়েরের মুখাবয়ব—খোঁচা দাড়িতে বরফ লেগে আছে। পীয়ের? কি আশ্চর্য! পীয়ের এখানে কেমন করে এল? প্রথমে আতঙ্কিত হলাম। পীয়ের আমাকে কি করে খুঁজে পেল? ও কি আমাকে অনুসরণ করেছে? অনুসরণ করলে কীভাবে করেছে? যেখানে নামিয়ে দিয়েছি সেখানে তো কোনো গাড়ি আমি দেখিনি।

গাড়ির সামনের আর পেছনের কাচের ওপর বরফ জমেছে। দরজা খুলতে গেলাম, পারলাম না, তুষারের স্তূপ বাইরে। জানালার কাচ নামাতেই কনকনে ঠাণ্ডার বাতাসের ঝাপটা মুখে লাগল। পীয়ের তুমি? তুমি এখানে কীভাবে এলে? জিজ্ঞেস করি বিস্ময়ে।

তুষারের মধ্যে পীয়েরের দু'পা ঢুকে গেছে, আমাকে দেখে তার মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত। ওহ! কেমন আছো তুমি? চিৎকার করে সে, মুখ দিয়ে শীতের ভাপ বের হয়। আর একজনের গাড়িতে যাচ্ছিলাম, তোমার গাড়ি বড় রাস্তা থেকে দেখে আমাকে নামিয়ে দিতে বললাম, ভাবলাম তোমার গাড়ি খারাপ হয়েছে, বলে পীয়ের।
রাতে বুঝিনি, এখন দেখলাম বড় রাস্তাটা ন্যাড়া গাছগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই ভেজা রাস্তার ওপর গাড়ির চাকার শব্দ আসে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে। পীয়েরের ব্যাখ্যাটা মনে হল যুক্তিযুক্ত, গতকাল আমার সঙ্গ হয়ত তার বেশ পছন্দ হয়েছে। কিন্তু পীয়ের, তুমি তো যাচ্ছিলে মন্ট্রিয়লে, তুমি আমেরিকার পথে কেন? জিজ্ঞেস করি আমি।

শোনো, সে বলে, তুমি আমাকে নামিয়ে দেয়ার পরে একটা রেস্তোরাঁয় বসে অনেক ভাবলাম। ভাবলাম মন্ট্রিয়লে গিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না, আমি সেখানে কাউকে চিনি না। কিন্তু তার পরই আমার খেয়াল হল বোস্টনে আমার এক বন্ধু আছে, তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই কথাটা তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে খেয়াল হয়নি, তুমিই তার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ। আমি যদি বোস্টন যেতে পারি তাহলে সেই বন্ধু হয়ত আমাকে কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে।

পীয়েরের ব্যাখ্যাটা আমার খুব একটা যুক্তির মনে হল না। আমার ধারণা ছিল কানাডায় পীয়েরের মতো লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে, আর রোনাল্ড রেগান ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানসিক ব্যাধির অনেক আশ্রয়স্থল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, পীয়েরের

মত মানুষের কাজ পেতেও অসুবিধে হয়। আর তার ওপর সে তো কানাডার লোক!

পীয়ের আমাকে গাড়ির চারদিকের তুষার পরিষ্কার করতে সাহায্য করল। তারপর হ্রদের ধারে সূর্য ওঠা দেখতে গেল। আমি যাত্রার জন্য গাড়ি গোছাতে লাগলাম। তখনই পেছনের সিটে স্লিপিং ব্যাগটা রাখতে গিয়ে, সামনের আর পেছনের সিটের মধ্যে, চোখে পড়ল একটা মাঝারি আকৃতির ধাতব বাক্স। এক গভীর নীল রঙে জ্বলজ্বল করছিল বাক্সটা। জিনিসটা আমার নয়। ঝুঁকে পড়ে ডান হাত দিয়ে বাক্সটা তুলতে চাইলাম, পারলাম না, বেশ ভারি। হাতের স্পর্শে বুঝলাম বাক্সের তল খুবই মসৃণ। মাথা তুলে চাইলাম দূরে পীয়েরের দিকে, হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে সে একমনে দূরের বনের ওপর সূর্যোদয় দেখছে। পীয়ের কি গতকাল এই বাক্স আমার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিল? আর সেজন্যই কি সে আজ ফিরে এসেছে? আর ফিরে যদি এলই তবে বাক্সটা চাইল না কেন? আমি বার্চগাছগুলোর দিকে তাকালাম, সকালের শুভ্র আলোয় বার্চের সাদা কাণ্ড সাদা তুষারের পটভূমিতে হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যায়নি। তখনই মনে হল রাতের আঁধারে বার্চের ঝোপ জ্বলছিল তুষারের প্রতিফলিত আলোয়, তবে কি সেই দুই অন্ধকার অবয়ব স্বপ্ন ছিল না? তবে কি সত্যিই এসেছিল অন্ধকারে অশরীরী ছায়ারা, আমার অজ্ঞাতে রেখে গেছে এক নীল বাক্স। কি উদ্দেশ্যে? গাড়ির চারদিকে তাকালাম, শুধু এক জোড়া পদচিহ্নের সারি সতেজ তুষারের ওপর ছাপ রেখেছে, চোখ দিয়ে অনুসরণ করে দেখলাম সেগুলো চলে গেছে বড় রাস্তার দিকে—পীয়েরের পায়ের ছাপ।

এ'সব সাতপাঁচ ভাবছি এমন সময় পীয়ের ফিরে এল। আমি কি পীয়েরকে জিজ্ঞেস করব বাক্সটার ব্যাপারে? কিন্তু কোনো একটা কারণে, যে কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব না, পীয়েরকে কথাটা বলতে পারলাম না। পরবর্তীকালে সেই মুহূর্তটা নিয়ে বহুবার ভেবেছি, কেন পীয়েরকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারি নি। এর একটা উত্তর হচ্ছে—আমি বাক্সটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাই সবকিছু ব্যাখ্যা করে না। পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেখেছি সেটা বলব না, অথবা মুহূর্তে মানুষের চরিত্র বুঝে ফেলার মতো ক্ষমতা আমার আছে সেটাও দাবি করতে পারব না, তবে পীয়েরের ব্যবহারে এমন এক স্বচ্ছতা ছিল যা নিয়ে আসে এক ধরনের বিশ্বাস, বাক্সটা তার হলে সে আমাকে বলত। সেই শীতের সকালে আর একটা কথা ভেবেছিলাম। নীল আমার প্রিয় রঙ, উজ্জ্বল নীল আমাকে সব সময় মোহিত করেছে—এমন একটা ব্যাপার যেন জেনেশুনে কেউ আমাকে সম্মোহন করার জন্য, চোখ ও মন কেড়ে নেয়ার জন্য, একটা খেলনা রেখে গেছে। চারদিকে তাকালাম। নির্মল মেঘশূন্য আকাশ, শীতের সকালের মৃদু সূর্য, তার আলোয় সাদা তুষারের চোখ ধাঁধানো প্রতিফলন, দূরে বরফ জমা হ্রদ, পীয়েরের পায়ের ছাপ, ন্যাড়া গাছের সারি পার হয়ে

হাইওয়ে, গাড়ির চাপা আওয়াজ—এর কোনো কিছুর মধ্যে কি ধাঁধার উত্তর নিহিত আছে?

পীয়েরকে কিছু বললাম না, দেখলাম সে গাড়ির ওপর জমা তুষার পরিষ্কার করছে। আমি তার সাথে যোগ দিলাম। তুষার জমে তখন বরফ—গাড়ির ওপর থেকে তা সরাতে দস্তানা পরা সত্ত্বেও আমার হাত জমে গেল। সব কাজ শেষ করে হাইওয়েতে উঠতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। পীয়েরকে নিয়ে আমার গাড়ি চলল দক্ষিণ দিকে ভারমন্ট স্টেটে।

ভাবছি বর্ডার পার হতে হবে, গাড়িতে একটা অজানা বস্তু, তার কী ব্যবহার জানি না, কাস্টমস গাড়ি চেক করলে কী বলব? পীয়েরকে জিজ্ঞেস করতেই হবে, আর যদি বাক্সটা তার না হয় তবে রাস্তার ধারে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে। একটা পেট্রল স্টেশনে থামলাম, সীমান্ত থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। কিন্তু আবারও কোনো অবোধ্য কারণে আমি না পারলাম পীয়েরকে প্রশ্নটা করতে, না পারলাম বাক্সটা নামিয়ে রাখতে।

বর্ডার। যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট কন্ট্রোল আমার মার্কিন ভিসা দেখে ছেড়ে দিল, কানাডীয়দের ভিসা লাগে না। পীয়েরের কাছে পাসপোর্ট নেই, সাধারণত ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখালেই যথেষ্ট, সেটা পীয়েরের ছিল। কন্ট্রোল অফিসার অনেকক্ষণ ধরে পীয়েরের লাইসেন্সটা দেখল, তারপর গাড়ির জানালা দিয়ে পীয়েরকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করল। আমার মনে হল এই একদিনে পীয়ের আরো রোগা হয়ে গেছে, সেই অভুক্ত কৃশ চেহারা যে কোনো বর্ডারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। অফিসার পীয়েরের লাইসেন্সটা নিয়ে তার বুথে ফিরে গেল। আমি হৃৎপিণ্ডের জোরালো প্রতিধ্বনি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম এই আশায় যেন কোনো রকম তল্লাশি ছাড়াই এই সঙ্কট পার হতে পারি। আমার আশায় ফল হল কিনা জানি না, মিনিট দুই বাদে অফিসার এসে পীয়েরের লাইসেন্স ফেরত দিল।

ভারমন্ট সুন্দর জায়গা। চওড়া রাস্তা চলেছে কখনো গাছে ঢাকা উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কখনো উৎরাই পার হয়ে পাহাড়ের গ্রানাইট পাথরের পাশ দিয়ে। উঁচু থেকে দেখা যায় নিচে সুন্দর সাজানো ছোট শহর, ছোট ছোট খামারবাড়ি, তাদের পাশে পুকুর, নদীর ওপরে কাঠের ঢাকা সেতু। অনেক খামারেই আছে আস্তাবল, সকালের রোদে কাঠের খুঁটির বেষ্টনীঘেরা জায়গায় হালকা তুষারের ওপর দৌড়াচ্ছে বাদামি, লাল আর কালো ঘোড়ারা, আর সেসব পার হয়ে নিরবচ্ছিন্ন বন। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা থামলাম সেন্ট জন্সবেরি শহরে, কোনো ফাস্টফুডের জায়গায়, ম্যাকডোনাল্ড হতে পারে। আমার মনে পড়ে ঐ শহরে নিউ ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহরের মতো ছিল লাল ইটের বাড়ি, লাল গির্জা, যার ছিল উঁচু লম্বা সাদা চূড়া যাকে ইংরেজিতে স্টিপল বলে। ছোট ছোট দোকানের পরিষ্কার কাচের পেছনে গোছানো বই, কেক আর প্যাস্ট্রি, পরিচ্ছন্ন রাস্তায় দু-একটা গাড়ির পেছন থেকে

বের হচ্ছিল শীতের ঘনীভূত ধোঁয়া। পীয়ের তার বোস্টনের বন্ধুকে ফোন করতে গেলে আমি গাড়ির পেছনের দরজা খুলে সিটের নিচে বাক্সটা দেখলাম, সেটা তখনও মনে হল উজ্জ্বল নীল আলোয় জ্বলছে। বাক্সের ওপরে হাত রাখলাম, আমার আঙুল আবার খুঁজে পেল একটা খুব ঠাণ্ডা মসৃণ তল, যা কিনা মুহূর্তে আঙুলগুলোকে প্রায় বরফ জমাট করে দিল, চমকে হাত সরিয়ে দিলাম। সচকিত আমি তাকালাম ডান হাতের আহত তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার দিকে, তারপরে ঐ অনাহূত বাক্সের দিকে। এর পরবর্তী অনুভূতি বুঝিয়ে বলতে পারব না, আমার মনে হল বাক্সটা তার চারদিকে নিজস্ব একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে, বাক্স যেন বুঝেছে ভারমন্টের ছোট শহরে ঐ শীতের সকালে আমার উপস্থিতি। নীল থেকে নীলতর হল তার রঙ। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে বাক্সটাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইলাম, যতক্ষণ না আমার পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

অবশেষে খাবার আনতে যখন দোকানে ঢুকলাম ভেতরের উষ্ণতাকে আমার দেহ সাদরে গ্রহণ করল। খুব একটা ভিড় ছিল না সেখানে, মিনিট দশের মধ্যেই খাবার নিয়ে গাড়িতে ফিরে গেলাম। খেতে খেতে রেডিওতে প্রথম খবর শুনলাম, কুইবেকে তুষার ঝড়ের পর বিপর্যস্ত জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে, মধ্যপ্রাচ্যে নানাবিধ অসন্তোষ, ডলারের তুলনায় ইয়েনের দাম বাড়ছে, আটলান্টিকে একটা বড় নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর ছিল পিঙ্ক ফ্লয়েডের গান।

Hello?
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me.
Is there anyone at home?

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে সব ঢেকে গেছে, তুষারের ঘূর্ণি আমাকে ঘিরে উঠে যাচ্ছে এক আকাশে, যে আকাশ অতি তীব্র সাদা প্রতিফলনে উদ্ভাসিত —সেই আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারদিকে একটা নমনীয় সাদা দেয়াল দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আর ঐ অসীমতার পার থেকে কে যেন চিৎকার করছে, হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? তখনই দেখলাম নিচে তুষারের মধ্যে পড়ে আছে বাক্সটা। হাঁটু গেড়ে বসলাম, বসে বাক্সটার ওপর থেকে তুষারের স্তর হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই ওপরের উজ্জ্বল নীল রঙ আমার চোখকে প্রায় অন্ধ করে দিল। তার মধ্যেও চারদিকের সাদা ঘনঘটার মধ্যেও ভেসে আসছিল শব্দ—টক টক টক, আমার কথা কী শুনতে পাচ্ছো? টক, টক, টক।

ঘুম ভেঙে গেল, আবারও পীয়ের জানালায় টোকা দিচ্ছে। জানালার কাচ নামাতেই সে বলল, তুমি কি ঠিক আছো? বললাম, ঠিক আছি। পীয়ের কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু ইতস্তত করছিল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে সে বলল, তুমি আর একজনকে বোস্টন পর্যন্ত লিফট দিতে পারবে? বললাম, কাকে? সে দোকানের দিকে হাত দেখাল। আমি প্রথমে দেখলাম কাচের জানালার ওপাশে একটা গাঢ় লাল জ্যাকেট, কোটের পকেটে দুটো হাত গোঁজা, তারপর মুখ—দূর থেকে তার মুখকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হল, তার তাকানোর ভঙ্গিতে, কোথায় যেন এক পুরোনো পরিচয় লুকিয়ে আছে। তরুণীটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হতে পারে। মনে রেখেছিলাম লাল জ্যাকেটের ওপর তার সোনালি চুল। ঐ ধূসর দোকানে লাল জ্যাকেটের ওপর তার সোনালি চুল রোদের মতো ঝলকাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক আছে, কিন্তু দুজনকে গাড়িতে জায়গা দেয়া মানে গাড়ির অধিকার ছেড়ে দেয়া। তাই শেষাবধি বললাম, পীয়ের! তুমি যদি চাও তবে অন্য কাউকে বলতে পার, তুমি এবং আরো একজন, দুজনকে নিতে পারব না। পীয়েরের মুখ দেখে মনে হল সে খুব হতাশ হয়েছে, সে মেয়েটিকে বলতে গেল আমার সিদ্ধান্তের কথা, কিন্তু সাথে সাথেই ফিরল না, দুজনে অন্তত মিনিট তিনেক কথা বলল, মেয়েটি এর মধ্যে আমার দিকে তাকাল। পীয়ের ফিরে এলে আমরা রওনা হলাম।

গাড়ি বড় রাস্তায় উঠলে পীয়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, পীয়ের ওই মেয়েটি কি তোমার পরিচিত? মনে হল না পীয়ের এই প্রশ্নে খুব আশ্চর্য হল। সে অনেক দূরে নিচে পাহাড়ের কোলঘেঁষে যাওয়া একটা নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার মনে হয় তাকে আমি কোথাও দেখেছি, তবে ঠিক কোথায় বা ঠিক কখন আমার মনে নেই।

পূর্ব দিক থেকে মেঘ ভেসে আসে পাহাড়ের পিঠ বেয়ে, সেই মেঘ নেমে যায় নিচের উপত্যকায়। ভারমন্ট থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ার হয়ে আমরা ঢুকলাম ম্যাসাচুসেটসে, তিন থেকে চার ঘণ্টা লেগে গেল বোস্টনে পৌঁছতে। বোস্টনের বাইরে একটা মেট্রো স্টেশনে পীয়েরকে নামিয়ে দিলাম। এই দুদিন তার সঙ্গ আমার বেশ ভালো লেগেছিল, তাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দুঃখই হল। আমি খুব ক্লান্ত, তাই বোস্টনের দক্ষিণে একটা মোটেলে থাকলাম রাতটা কাটাতে। কিছু কাগজ দিয়ে বাক্সটা ঢেকে রাখলাম যাতে গাড়ির বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়। মোটেলের ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবলাম আজ আবার কিসের স্বপ্ন দেখব? কিন্তু সে রাতে আর কোনো বার্তা এল না, কেউ আর ডাকল না, যদিও আমার মাথায় কেবল দুটো লাইন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

Hello?

Is there anybody in there?

দিন ৩. ম্যারিল্যান্ড

এরপর কোনো বড় ধরনের ঘটনা ছাড়াই ফিরে এলাম ম্যারিল্যান্ডে। পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কানাডা ও নিউ ইংল্যান্ডের তুষারের পরে ম্যারিল্যান্ডের আবহাওয়া অত কঠিন ছিল না, পাতাঝরা ম্যাপল জায়গা করে দিল পাইন, এল্ম আর ওক গাছকে। আমার গাছে-ঢাকা অ্যাপার্টমেন্ট সারিতে পৌঁছে প্রথমেই বাক্সটা ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, সেটা তখনও জ্বলছিল উজ্জ্বল নীল আলো ছড়িয়ে। গতকালের শীতল অভিজ্ঞতা আমি ভুলে যাইনি, তাই হাত বাঁচাতে দস্তানা পরে বাক্সটা গাড়ি থেকে নিচে নামালাম, বাক্সটার ওজন প্রায় দশ কিলো হবে। দোতলায় বাক্সটা তুলে আমার অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই এক অপার্থিব নীল রঙে ঘর ভরে গেল, মেঝেতে বাক্সটা রেখে বাতি জ্বালতেই সেই নীল হালকা হল। এক নিরবচ্ছিন্ন তল দিয়ে ঘেরা ছিল বাক্সটা, তার বাইরে এমন কোনো ফাঁক ছিল না যা দিয়ে সেটাকে খোলা সম্ভব, শুধু এক কোণে ছিল প্রায় দেখা যায় না একটা ছোট অস্বচ্ছ কাচের বৃত্ত। ঐ কাচের বা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসের পেছনে কী ছিল তা দেখতে চাইলাম, তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভেসে আসে এক দ্বিধান্বিত স্বর যা কিনা ইতিমধ্যে আমার পরিচিত। হ্যালো, হ্যালো, আমি পীয়ের বলছি।

কেন জানি ঐ টেলিফোন কলটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। যেন এমনটাই কথা ছিল, যে মুহূর্তে আমি বাক্সটা মেঝেতে রাখব সে মুহূর্তেই টেলিফোন বাজবে, পীয়ের কথা বলবে।

তবু নিশ্চিত হতে চাই। পীয়ের?

হ্যাঁ, পীয়ের। আমি বোস্টন থেকে বলছি। হলুদ আর নীল আলোয় ভরে থাকে আমার ঘর, তার মধ্যে পীয়েরের কণ্ঠস্বর মনে হয় ভেসে আসে অন্য নক্ষত্র থেকে। পীয়ের, তুমি আমার নম্বর পেলে কোনোখান থেকে? আমি বলি।

পীয়ের বোঝে না আমার প্রশ্ন। কী? কী? কী বললে তুমি? পীয়ের বলে। মিনিট খানেক লেগে গেল তাকে আমার প্রশ্নটা বোঝাতে। পীয়ের উত্তর দেয়, কেন, তোমার নাম আর ঠিকানা থেকে।

যখনকার কথা বলছি তখনও ইন্টারনেট আসেনি, তবে নাম ও শহরে জানা থাকলে টেলিফোন কোম্পানিকে ফোন করে নম্বর জানা যেত।

কিন্তু পীয়ের, তোমাকে তো আমি আমার পদবি বলিনি, ঠিকানাও দিইনি। আমি বলি। আরো কিছু সময় গেল তাকে আমার কথাটা বোঝাতে।

না, দাওনি, তবে কি জান তোমার গাড়ির পেছনের সিটে তোমার পুরো নাম-ঠিকানা লেখা একটা খাম ছিল। পীয়ের বলে। আমি সেটা মনে রেখেছি, তারপর আমাকে এখানে একজন সাহায্য করেছে তোমার নম্বর খুঁজে পেতে।

লাল জ্যাকেট, সোনালি চুল এক মাথা আমার মনে উঁকি দেয়, পীয়েরের ভাঙা ইংরেজি বুঝতে আমার অসুবিধা হয়।

বলতে চাইলাম, পীয়ের তুমি কী চাও? কিন্তু পারলাম না। বললাম, কী করছ এখন তুমি?

শোনো, পীয়ের বলে, বোস্টনে আমার বন্ধুকে খুঁজে পেলাম না। এদিকে আমার ভীষণ অবস্থা। আমি একটা গ্রে-হাউন্ড বাস ধরে ওয়াশিংটন রওনা হচ্ছি। তোমার কাছে কি আমাকে একটা রাত থাকতে দেবে, আমি এক রাতের বেশি থাকব না, কথা দিচ্ছি।

আবারও হয়তবা সেই দশ কিলো ভরের নীল বাক্সের তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রভাব ক্ষেত্রের জন্যই, আমার কাছে পীয়েরের অনুরোধ অপ্রত্যাশিত ছিল না। পীয়ের, তুমি এখানে এসে কি করবে? আমি বলি ক্ষীণ কণ্ঠে।

শোন, পীয়ের বলে, বোস্টনে এক মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সে ওয়াশিংটনের একজনের নাম দিয়েছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সে সোমবারের আগে আসছে না, তাই তোমার কাছে কি এক রাত থাকতে পারি?

আবার ফিরে আসে সেই চকিত স্মৃতি— তুষারাবৃত লাল ইটের সাজানো শহরের এক ধূসর দোকানে সোনালি চুলের ঝলক। বুঝলাম পীয়ের আমার জীবন থেকে সহজে বিদায় নেবে না। বললাম, কখন পৌঁছবে তুমি ওয়াশিংটনে? আমি আত্মসমর্পণ করলাম, কোনো যুক্তি ছাড়াই। আমি জানতাম ঐ আত্মসমর্পণ ছিল না পীয়েরের কাছে— সেটা ছিল এক রহস্যময় বাক্সের কাছে, আর হয়তবা আর এক অলীক চরিত্রের কাছে যার লাল জ্যাকেট সূর্যের মতো

এক ধূসর ঘরে ঝলকাচ্ছিল।

পীয়ের এর উত্তরে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সে গ্রেহাউন্ড বাসে করে আসছে, তাকে নিউইয়র্কে বাস বদলাতে হবে, তাই পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল পাঁচটা-ছয়টা হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, বাসস্ট্যান্ড থেকে আমাকে ফোন করো, নিয়ে আসব, আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

ফোন ছেড়ে পীয়ের কী করে আমার ফোন নম্বর পেতে পারে সেটা ভাবলাম। সে যে কারণ দেখিয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আমার পুরো ঠিকানাটা সে মনে রেখেছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না।

সেই রাতের স্বপ্নে কোনো আতঙ্কিত বার্তা পেলাম না, ঐ রাতের স্বপ্নে হাঁটছিলাম এক আলো-আঁধারি করিডোরে, করিডোরের দেয়ালে ছিল অস্পষ্ট মধ্যযুগীয় তৈলচিত্র, দা ভিঞ্চি, রেমব্রান্ডট, এল গ্রেকো, ব্রুগে, প্রতিটি চিত্রকর্মে চিত্রিত চরিত্ররা তাকিয়েছিল অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ছিল ফ্রেমে বাঁধা সীমাবদ্ধ বিচলতা, সময়ের বাঁধন পেরিয়ে তারা সবাই হয়ে উঠেছিল আধুনিক, জীবনের সংশয়ে বিপর্যস্ত। অবশেষে করিডোরটা শেষ হয়ে গেল এক বিশাল হলঘরে যার চক্রাকার ব্যূহতে ছিল খিলান দেয়া স্তম্ভ, ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল অসীম ওপরে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম আমি, আবিষ্কার করলাম সিঁড়ির দুপাশে সাজানো বই, অসংখ্য বই, চামড়ায় বাঁধানো পুরোনো বইয়ের সারি। বইগুলোর নাম পড়তে পারলাম না, নামগুলো লেখা ছিল এক অজানা হরফে। অনেক চেষ্টা করলাম সেই হরফের অর্থোদ্ধার করতে, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল।

তবু ঐ আবছা আঁধারে একটা বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার বাদামি চামড়ার মলাটে একটা মাত্র অজানা হরফ, কিংবা সেটা হতে পারে একটা প্রতীক, সেই প্রতীক অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে থাকে... নীল রঙে। ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে বইটা স্পর্শ করতে চাই। কিন্তু আমার আঙুলের ছোঁয়ায় অন্তর্হিত হয়ে যায় বইটা, পাল্টে যায় পুরো দৃশ্য, নিজেকে আবিষ্কার করি এক নতুন পটভূমিতে, এক দিকচিহ্নহীন বালুর মরুভূমিতে। বালুতে খোঁজ করি পদচিহ্নের, চোখে পড়ে এক জোড়া পায়ের ছাপ, বালুর পাহাড় পেরিয়ে সেই ছাপ চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। ঐ পদচিহ্ন কি আমার?
অথচ এরপরে আমার আচরণকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। জামার পকেট থেকে একটা

ব্রাশ বের করি, হাঁটু গেড়ে বসে পদচিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করি। এক দুই তিন চার... অনেক সময় কেটে যায় ঐ পায়ের ছাপগুলো মুছে দিতে, চার লক্ষ, চার লক্ষ এক, চার লক্ষ দুই...। এর মাঝে মনে হয় আমার ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি (হয়ত ঘুমের মধ্যেই) এসব কি পীয়েরের পায়ের ছাপ? তারপর আবার ফিরে যাই সেই ছাপ মুছতে, মাইলের পর মাইল পার হয়ে যায়, তবু পদচিহ্নের সারি শেষ হয় না, দশ কোটি তিন, দশ কোটি চার...। বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি পার হয়ে যাই, কিন্তু আকাশে সূর্য নির্দিষ্ট থাকে এক জায়গায়। এর মধ্যে মনে হয় আরো কয়েকবার ঘুম ভেঙে যায়, বাইরের বসার ঘর থেকে ভেসে আসে এক আবছা নীল আলো। তারপর ঘুম ভেঙে যায়।

দিন ৪. ম্যারিল্যান্ড

সেদিন ছিল রোববার, কাজের তাড়া নেই। কফি বানাতে বানাতে মনে পড়ল পীয়ের বলেছিল গাড়ির পেছনের সিটে আমার নাম লেখা একটা খাম আছে। ম্যারিল্যান্ডের শীতের সকালটা ছিল হালকা কুয়াশায় ঢাকা, বসার ঘরের বড় কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাড়ির সামনের বিশাল চেস্টনাট গাছটা, গাছের পাতারা মেঘের মধ্যে জেগে ছিল। স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ছিল সেই সকাল, নিচে নেমে গাড়ির কাছে গিয়ে পেছনের সিটটা দেখলাম। নীল কাপড়ের সিটের ওপর পড়েছিল একটা সাদা খাম। অনেক ধরনের চিঠিপত্র আসে, যাকে জাঙ্ক মেল বলে, বেশির ভাগই হয় কোনো ক্রেডিট কার্ডের বিজ্ঞাপন, না হয় বাড়ি কেনার জন্য ঋণের আশ্বাস। অনেক সময় আমি গাড়ির পেছনে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের বিল রেখে দিই যাতে ডাকঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ফেলে দিতে পারি। এই খামটা তুলে দেখলাম সেটা না-খোলা, ওপরে বেশ বড় টাইপে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে, কিন্তু কোনো ডাকটিকিট নেই, ডাকঘরের ছাপ নেই, নেই ফেরত ঠিকানাও। খামটা নিয়ে ঘরে ফিরলাম, খুলে দেখলাম ভেতরে একটা বিজ্ঞাপনের প্রচারপত্র, তাতে লেখা—
আরিজোনা ও ইউটায় রয়েছে কিছু চমকপ্রদ গিরিখাত। এই সব গিরিখাত অন্য সব গিরিখাতের মতন নয়, ছোট পরিধির এই গিরিখাতগুলো স্লট ক্যানিয়ন নামে পরিচিত, যার প্রস্থ অনেক সময় মাত্র দু-তিন ফুট। এই সমস্ত গিরিখাতে আলো আঁধারের খেলা সৃষ্টি করে এক রহস্যময় আবহাওয়া যা যে কোনো অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মনকে রোমাঞ্চিত করবে।

প্রচারপত্রে স্লট ক্যানিয়নের বেশ কিছু সুন্দর ছবি আছে, কিন্তু প্রকাশকের নাম নেই। জিনিসটা এমন যেন আমার জন্য বিশেষ করে সেটা ছাপানো হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম কানাডা যাওয়ার আগে খামটা আমি দেখিনি। কাগজটা হাতে নিয়ে বসার ঘরের মাঝে রাখা

বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রোদে ভোরের কুয়াশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে, গাছের ডাল আর পাতার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ঘরের দেয়ালে সাদা কালো মোটা দাগে। সকালের আলোয় বাক্সের উজ্জ্বল নীল রঙ ফিকে হয়ে আসে, ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে যায় বাক্সের তল, আমার মনে হয় বাক্স বুঝেছে আমার উপস্থিতি। কোনো এক অদৃশ্য আদেশে আমি বসে পড়ি মেঝের কার্পেটের ওপর, বসে তাকিয়ে থাকি বাক্সের দিকে সম্মোহিত হয়ে।

এভাবে কেটে যায় অনেক সময়, ঠাণ্ডা হয়ে যায় সকালের কফি, ফিরে যাই আবার নিষ্কর মরুভূমিতে, হেঁটে পার হই উষ্ণ গৈরিক প্রান্তর। কিন্তু ঐ মরুভূমি শেষ হয়ে যায় এক আশ্চর্য নীলাভ হিমবাহতে। এ কী করে সম্ভব? নিষ্কর মরুভূমি বাস করে শীতল তুষারের পাশে? নিজেকে ভাবি যেন এক প্রাচীন যোগী যে বসে আছে এক পুরাতন ধ্যানে, গ্রীষ্ম ও শীত, বালি ও বরফের সীমানায়। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেখানে শুরু হয়েছে মহাশূন্য, সেই সীমানায় আমার মন বিস্তৃত হয়ে যায় মহাবিশ্বের কালো অসীমতায়। ধ্যান ভেঙে গেল, নিজেকে আবিষ্কার করি বসার ঘরে নীল বাক্সের সামনে। সূর্য ততক্ষণে হেলে পড়েছে পশ্চিমে, বাক্স থেকে বিচ্ছুরিত কোনো ক্ষেত্র আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল কয়েক ঘণ্টা ধরে।

ভাবলাম এই চক্র থেকে আমাকে বের হতে হবে, দিনের আলো থাকতে থাকতে, নইলে সবটা সময় কেটে যাবে স্বপ্ন দেখে। বাক্স ঢুকিয়ে রাখলাম দেয়ালের ক্লোজেটে। ভাবলাম প্রচারপত্রের স্লট ক্যানিয়নের কথা, এ বিষয়ে দু-একটা বই দেখলে মন্দ হয় না। গেলাম বর্ডার্স নামে বিশাল বইয়ের দোকানে, তিনতলা দোকান, অনেক খুঁজে ভ্রমণ অংশে গিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আর আরিজোনা, ইউটা আর কলোরাডোর ওপর কিছু বই পেলাম। আরিজোনার উত্তরে ও ইউটার দক্ষিণে দেখলাম প্রচুর স্লট ক্যানিয়ন আছে, কমলা স্যান্ডস্টোন পাথরে জলের স্রোতে কাটা সরু গিরিখাতগুলো যেন কোনো ভাস্কর তার হঠাৎ খেয়ালে সৃষ্টি করেছে, এসব গিরিখাতের প্রতিটি বাঁকের আড়ালে অপেক্ষা করছে অপার্থিব রহস্য। একটা বইয়ে এ রকম একটা ছবি দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে বইয়ের তাকগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে, কালো চুল, লম্বা কালো ওভারকোট, সুস্পষ্ট চিবুক, উজ্জ্বল চোখ। তার বয়স পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। সে আমার দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল না, মনে হল (কিন্তু সেটা আমার ভ্রম হতে পারে) তার লাল সরু ঠোঁটের রেখা যেন বিস্তৃত হল এক মৃদু, খুবই মৃদু হাসিতে। দুই সেকেন্ড, বড়জোর তিন, তারপর সে ঘুরে হেঁটে চলে গেল করিডোরের অন্যপ্রান্তে, এরপর বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্য বইয়ের তাকের

পেছনে।

এ রকম কি হওয়ার কথা ছিল? আমি নিজেকে যেন আবিষ্কার করলাম ইউটার স্লট ক্যানিয়নে, তার সর্পিল বাঁকে অপেক্ষা করছে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বইয়ের সারি পার হয়ে যখন সেই কালো ওভারকোটের সন্ধান করলাম, দেখলাম সে দোকানের বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার কোনো বিশেষত্ব নাও থাকতে পারত, কিন্তু তার হালকা হাসির মধ্যে এক পরিচিতির আভাস ছিল, ঐ হাসি যেন বলছিল তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবার কথা ছিল, আমি খুশি যে তুমি আলো-আঁধারি গিরিখাত খুঁজে পেয়েছ। তার কালো বুটের দৃঢ় পদক্ষেপ যেন বলছিল আমাদের আবার দেখা হবে, আ.।

বই কিনে যখন বাইরে আসি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা পড়েছে, গাড়িতে ঢুকে গরম হাওয়া চালিয়ে দিয়ে ভাবি গত কয়েক দিনের ঘটনা, তাদের যোগসূত্র কী। সময় এসেছে এই যোগসূত্র ছিন্ন করবার, আমার পীয়েরকে বাসস্ট্যান্ড থেকে তুলতে যাওয়া উচিত হবে না। এক অস্বচ্ছ ষড়যন্ত্রে আমি অনিচ্ছুক সহযোগী, সেই ষড়যন্ত্রের জালে রয়েছে এক সবুজ গহিন বনের কেবিন, বিশাল লাইব্রেরি, ঊষর বিস্তৃত মরু, শীতল নীলাভ হিমবাহ। রয়েছে অসহায় মানুষের আকুতি (মনে পড়ে বনের সে কেবিনে রেডিও বার্তা) আর অজানা পদচিহ্ন।

তবু নিজেকে এই জাল থেকে মুক্ত করতে পারি না, বইয়ের দোকান থেকে আমি যাই গ্রেহাউন্ড বাসস্ট্যান্ডে পীয়েরকে তুলতে। পীয়ের যখন বাস থেকে নামল তাকে দেখে মনে হলো ক্লান্ত। আমাকে দেখে সে খুশি হল, কিন্তু তার মুখ থেকে সরে গেল না ম্রিয়মাণতা। ভাবলাম বোস্টনে গিয়ে সে হতাশ হয়েছে, যে বন্ধু তাকে চাকরির আশ্বাস দিয়েছিল সে হয়ত কথা রাখেনি। পীয়ের বলল, সকালে অন্য এক বন্ধু তাকে তুলে নেবে। গাড়িতে আমরা দুজনেই নিশ্চুপ ছিলাম। আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পীয়ের পাঁচ মিনিট বসে রইল বসার ঘরে, তারপরে অতিথি-ঘরে ঘুমোতে গেল কোনো বাড়তি কথা না বলেই।

বাক্সটা রেখেছিলাম আমার শোবার ঘরের ক্লোজেটে। জানতাম ঐ রাতে আমি ভেসে যাব এক সবুজ নীল তুষারের স্রোতে। তাই রাতে চোখ বোজা মাত্রই ফিরে যাই দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতা ছেড়ে একান্ত নিজস্ব কল্পনার জগতে, সেই কল্পনায় পার হচ্ছিলাম এক বিশাল উঁচু পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে আদিগন্ত বিস্তৃত হিমবাহ, অনুসরণ করছিলাম এক সারি পদচিহ্ন, সেসব পদচিহ্ন চলে গিয়েছিল দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। আমার পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে আর চলতে পারলাম না, আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম এক সীমাহীন তুষার প্রান্তরে, আমার শরীর ঠাণ্ডায় জমে যেতে থাকল। কিন্তু ঐ

স্বপ্নে আর একটা জিনিস ছিল যা সকালে মনে করতে পারলাম না।

দিন ৫. ম্যারিল্যান্ড

কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সকাল সাতটা। দরজা খুলে যাকে দেখলাম তাকে আমি আশা করিনি, তার গায়ে লম্বা কালো ওভারকোট, চোখে কালো চশমা। গতকালের সেই কালো চুল মেয়ে, সে বলল, বন জুর, আমার নাম ইসাবেল, আমি পীয়েরকে নিতে এসেছি।

যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। তার কথায় ছিল দ্বিধাহীনতা, ভঙ্গিতে ছিল আত্মবিশ্বাস, কালো বুট তার ঋজু দেহকে ধরে রেখেছিল এক মসৃণ লম্বরেখায়। তার কালো চশমা দেখতে দিচ্ছিল না চোখের মণিকে, চশমা তাকে করে তুলেছিল রহস্যময়ী। নির্বাক হয়ে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকি, তারপর বলি ভেতরে ঢুকতে। সে বসলে তাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাই, কিন্তু আমার বাকরুদ্ধ হয়ে থাকে। আবারও দেখি এক মৃদু হাসি বিস্তৃত হয় তার লাল ঠোঁটে, মুহূর্তখানেক মাত্র, তা মিলিয়ে যায় এমন এক ভঙ্গিতে যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। আরো দু-তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকি, আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু ঠিক কোন প্রশ্নটা করব সেটা বুঝে পাই না। আমার মনে হয়, চশমার পেছনে তার চোখের মণি জ্বলে উঠেছিল এক নীলাভ রঙে, পরে বুঝেছিলাম সেই মণির রঙ ছিল কালো। আর একটি জিনিস লক্ষ করেছিলাম, তার গালের হাড় ছিল উঁচু যা কিনা তার মুখাবয়বকে দিয়েছিল এক ধরনের সুদৃঢ়তা। কোনো প্রশ্ন না করে পীয়েরকে ডাকতে যাই।

পীয়ের! ইসাবেল এসেছে, দরজায় টোকা দিয়ে আমি বলি। বিধ্বস্ত চেহারায় পীয়ের বের হয়ে আসে। কে? ঘুম চোখে সে জিজ্ঞেস করে।

ইসাবেল, তোমার বন্ধু। বলি আমি।

ইসাবেল? বিস্ময়ে ভরে যায় পীয়েরের মুখ। তাকে দেখে মনে হল হয় সে ইসাবেলকে এই সময় আশা করেনি, নয়ত সে এই প্রথম তার নাম শুনছে। আমি হাত দিয়ে বসার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে ভেতরে চলে যাই।

ইসাবেল কি আমাকে অনুসরণ করছে? সে কি জানত আমি বইয়ের দোকানে যাব? সে কি বাক্সটার খোঁজ করছে? ইসাবেল কি ভাবছে সেই বাক্স পীয়েরের কাছে আছে? প্রশ্ন এমন অজস্র যে আর সেগুলো নিয়ে ভাবতে চাইলাম না। কিছুটা আনমনাভাবে শোবার ঘরের ক্লোজেট কুলে দেখি নীল রঙে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সবকিছু, বাক্সটা সূর্য হয়ে জ্বলছে। তার পরই মনে হল বাক্সর দীপ্তি কমে গেল, যেন বাক্স আবার বুঝেছে, কোনো এক অবোধ্য

যান্ত্রিক অনুভূতি প্রয়োগে আমার উপস্থিতি। ক্লোজেটের ভেতর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা, নীল বাক্স সৃষ্টি করেছে শৈত্যপ্রবাহ, মনে হল স্বপ্নের দিগন্ত প্রসারিত হিমবাহে দাঁড়িয়ে আছি। দ্রুত ক্লোজেট বন্ধ করে দিলাম, নীল আলোর ছটা ক্লোজেটের দরজার ফাঁক দিয়ে পাতলা ফালি হয়ে পড়ল ঘরের অন্য দেয়ালে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হয় বেরিয়ে আসি, পীয়ের আর ইসাবেল পাশাপাশি বসে আছে, চুপচাপ। আমি বসলাম, ইসাবেলকে আমার নাম বললাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো গতকাল সেই বইয়ের দোকানে ছিলেন? ইসাবেল উত্তর দেয়, হ্যাঁ। বললাম, এটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

ইসাবেল উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বড় জানালাটার দিকে গেল। আসলে জানালা নয়, বড় প্রস্থের কাচের দরজা, বাইরে ছোট বারান্দা। সেখান থেকে দেখা যায় শীতের পাতাঝরা ম্যাপল ও ওকগাছ আর তাদের মধ্য দিয়ে দূরের বাড়িগুলো। এখানে শীতের সময় তিন-চারবার তুষারপাত হয়, কিন্তু এখন মাটি অনাবৃত। সকালে কাজে যাচ্ছে লোকজন, তারা গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে, গাড়ি থেকে ধোঁয়া ঘনীভূত হয়ে উঠছে ওপরে।
ইসাবেল আমার দিকে তাকায় না, বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, এই প্রশ্নটা যথাযথ, তবে এর উত্তর আমি এখনই দিতে পারব না। ইসাবেলের ইংরেজি উচ্চারণে ফরাসি টান, কিন্তু তার ইংরেজি বোধগম্য, পীয়েরের মতো নয়।

পীয়েরের দিকে তাকালাম। মনে হল সে ইসাবেলের ঘটনায় আমার চাইতে কম অবাক হয়নি। সেও আশ্চর্য হয়ে ইসাবেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ইসাবেল ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর পীয়েরকে বলে, আর দেরি করো না, আমাদের এখন বের হতে হবে। বললাম, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ইসাবেল উত্তর দিল, দক্ষিণে।

দক্ষিণে? দক্ষিণে মানে কী? আমি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। পীয়ের ঘর ছেড়ে চলে যায়, ইসাবেল আবার বাইরের দিকে তাকায়। জানালার কাচের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে, তার প্রশ্বাস ঘনীভূত হয়ে উঠছিল কাচের ওপরে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর কাচের বাইরে কাউকে উদ্দেশ করে যেন ইসাবেল বলে উঠল, পীয়েরকে আপনার যা মনে হয় সে তা নয়। পীয়ের আমাদের সবার জন্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাকে আপনার এখানে থাকতে দেয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এর উত্তরে কী বলা উচিত সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না, 'আমাদের' বলতে ইসাবেল

কাদের বোঝাচ্ছে? আমি শুধু বললাম, আমাদের মধ্যে কি আমি আছি? পীয়ের কি আমার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ? ইসাবেল ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল, কিন্তু তার সব হাসির মতোই সেটার অস্তিত্ব ছিল ক্ষণিক, তার ঠোঁট মুহূর্তের জন্য বিস্তৃত হল মাত্র। এবার বুঝলাম তার চোখের মণি গাঢ় কালো, ঘরের মৃদু আলো তাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল, তার উজ্জ্বল চোখ থেকে আমার দৃষ্টিতে নামিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। সে বলল, আপনার প্রশ্ন আপনার জন্য কি পীয়ের গুরুত্বপূর্ণ? আমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নই, তবে মানুষের জীবন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভরা। আপনি কি অপ্রত্যাশিত ঘটনা পছন্দ করেন না?

ভাবলাম নীল বাক্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত, পীয়ের অপ্রত্যাশিত, ইসাবেল অপ্রত্যাশিত। কেবল অপ্রত্যাশিত জিনিসই কি গুরুত্বপূর্ণ? আমি ইসাবেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। অবশেষে বললাম, পীয়েরের কাজটা কি দক্ষিণে?

হ্যাঁ, পীয়েরের কাজটা দক্ষিণে, ইসাবেল বলে, হেসেই উত্তর দেয় সে। হাসিতে লেগে থাকে দুঃখের রেশ।

বের হওয়ার আগে পীয়ের একটু দ্বিধার সঙ্গে তার হাত বাড়িয়ে দিল আমার সাথে করমর্দন করার জন্য। ধন্যবাদ আ., পীয়ের বলে, এসবকিছুই একটা বড় অভিযান, কোনো অভিযানের শুরু ও শেষ নেই। আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই ইসাবেল তাকে হাত ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। জানালা দিয়ে তাদের দেখলাম ইসাবেলের গাড়িতে উঠতে। ইসাবেলের চোখে আবার কালো চশমা, গাড়িতে ওঠার আগে সে পীয়েরের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পীয়েরের চশমাটা বের করে পীয়েরকে পরিয়ে দেয়। সেই চশমা পরিয়ে দেয়ার ভঙ্গির মধ্যে ছিল বহুদিনের পরিচয় আর বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাসের মাঝে আমার স্থান নেই, পীয়েরকে খুব ঈর্ষা হলো। এই নিয়ে তৃতীয়বার পীয়ের বিদায় নিল আমার জীবন থেকে। তার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে না? কার অভিযানের কথা পীয়ের বলছিল, তার না আমার? আর তখনই মনে পড়ল গতরাতের স্বপ্নের ভুলে যাওয়া অংশটা—সেটা ছিল পশ্চাৎপটে একটা বাঁশির মূর্ছনা, ইলেকট্রনিক বাঁশির শব্দ হিমবাহ ছপিয়ে বইছিল শীতের বাতাসে। সেই বাঁশির আবাহন ছিল করুণ, তার সুরে ছিল হয় এক হৃদয়ের আকুতি, নয় অমোঘ কোনো অশনিসঙ্কেত যা এক বিশাল সমষ্টির জন্য নিয়ে আসবে দুর্যোগ।

ওরা চলে গেলে বাক্সটাকে একটা কালো ব্যাগে ঢুকিয়ে কাজে গেলাম। সারা ল্যাবে একগাদা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছড়ানো, ল্যাবের একটা দরজায় লেখা স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। আমাদের ল্যাবে তিনজন মাত্র লোক, প্রফেসর জেফ্রি হিল—ল্যাবের

অধিকর্তা, আমি ও আমার সহকর্মী যতীন দাস থারামেল। যতীন দাস কেরালার ছেলে, তার বাবা বাংলার খুব ভক্ত ছিলেন বলে ছেলের নাম রেখেছিলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তান যতীন দাসের নামে। বাংলার যতীন দাস ১৯২৯ সালে লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশন ধর্মঘট করে ২৫ বছর বয়সে মারা যান—(আর এক বিপ্লবী যতীন—যতীন মুখোপাধ্যায়, যাকে আমরা বাঘা যতীন বলে জানি, ১৯১৫ সালে উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীরে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে সরাসরি অস্ত্রযুদ্ধে নিহত হন)। আমার বন্ধু যতীন দাস নিজে ছিল শরৎচন্দ্রের খুব ভক্ত, মালয়ালী ভাষায় সে বিমল করের বইও পড়েছে। কিন্তু শীতের ঐ সকালে যতীন দাস ল্যাবে ছিল না। বাক্সটাকে ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলাম। প্রথমে একটা ফ্যাকাশে সাদা আলোয়, তারপর তীব্র নীল আলোয় জ্বলল বাক্সটা। ঠাণ্ডা হয়ে এলো ল্যাব, তুষার যেন জমল প্রতিটি যন্ত্রের ওপর। আমার পরিকল্পনা ছিল বাক্স থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আসছে কিনা সেটা দেখা; কিন্তু রোববারের সকালের মতো আমি আবারও সম্মোহিত হয়ে, সেই ঠাণ্ডায়, প্রায় অন্ধকার ঘরে, বসে রইলাম ঘণ্টাখানেক যতক্ষণ না যতীন এসে ল্যাবের সব আলো জ্বালিয়ে দিল।

যতীন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার আ.? অন্ধকার ঘরে একটা নীল আলো জ্বালিয়ে বসে আছ? যতীনকে সবকিছু বললাম। যতীন বুদ্ধিমান ছেলে, সহজে কোনো কিছুতে আশ্চর্য হয় না। সে বলল, তোমার প্ল্যানটা ঠিকই আছে, আমাদের দেখতে হবে বাক্স থেকে কোনো বিকিরণ বের হচ্ছে কিনা।

বাক্সটির পৃষ্ঠের ছ'টা তলই ছিল অস্বাভাবিক মসৃণ, আমরা বাক্সটার ওপরে কোনো ধরনের ফাটল বা চিড় খুঁজে পেলাম না যা দিয়ে সেটা খোলা সম্ভব— এমন যেন ভেতরে যা বসাবার বসিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে কোনো ছাঁচের মধ্যে ঢেলে বাক্সটা তৈরি হয়েছে। একটা ঘনক, নিখুঁত প্রতিসম, শুধু তার এক পৃষ্ঠে ছিল একটা ছোট গোলাকৃতি অস্বচ্ছ কাচ। গাইগার কাউন্টার আর গামা ক্যামেরা দিয়ে বাক্সটার তেজস্ক্রিয়তা মেপে কিছু হিসেব-নিকেষ করার পর আমাদের মনে হলো সাধারণ পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে একটু বেশি বিকিরণই বের হচ্ছে বাক্সটা থেকে। তবে বিকিরণের উৎস কী হতে পারে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম এই জন্য যে, তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুব বেশি নয়।

আমাদের কাছে বাক্সটা ছিল আদর্শ কালো বাক্স, ইংরেজিতে ideal black box; কিন্তু আমরা জানি না এই বাক্সের উদ্দেশ্য কী। দৈবিক বাক্স কি আমার জীবনের অভিযানকে নির্ধারণ করবে? যতীন বলল, বাক্সের ওপর যে অস্বচ্ছ কাচটা আছে তার ওপর বিভিন্ন

তরঙ্গ দৈর্ঘের লেজার রশ্মি ফেলে দেখতে হবে কাচের পেছনে কি আছে। মাস স্পেক্ট্রোমিটারে পরীক্ষা করে দেখতে হবে বাক্সটা কি ধাতুতে তৈরি। তারপর একটু ভেবে যোগ করল, বাক্স থেকে কোনো রেডিও সঙ্কেত আসছে কিনা সেটাও আমাদের দেখতে হবে। বেতার সঙ্কেত? কী ধরনের বেতার সঙ্কেত, মহাশূন্যের প্রান্তরে ভিন গ্রহবাসীর বার্তা? নাকি যন্ত্র থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম বেতার তরঙ্গ। হয়ত বা সেই জলভেজা বনের শ্যাওলা ধরা কাঠের কেবিনে বসে থাকা রেডিও অপারেটরের মতো আমি সঙ্কেত পাচ্ছি এই বাক্স থেকে; কিন্তু ধরতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, তবে সম্মোহিত হচ্ছি, স্বপ্ন দেখছি বিস্তৃত নীল হিমবাহের, ধূসর মরুভূমির। বাক্সটা আমার কাছে এসেছে—সেটা কি নিতান্তই একটা কাকতালীয় ঘটনা?

সন্ধ্যা হয়ে এল, আলো জ্বলল রাস্তায়, বাক্সটা ল্যাবে রেখে এলাম। আলো-অন্ধকারে বাসার পথে গাড়ি চালাতে চালাতে মনে পড়ল ইসাবেলের কথা। সোডিয়ামের হলুদ আলোয় রাস্তা হয়ে উঠল নির্জন, একটা জনশূন্য ট্রাফিক স্টপে তুষার পড়তে আরম্ভ করল, সাদা তুষারের সমুদ্রে মনে পড়ল কালো ওভারকোটে ঢাকা ইসাবেলকে। ইসাবেলের সঙ্গে কি আর দেখা হবে? অনেক প্রশ্ন আমার মনে, ইসাবেল কেন আমাকে অনুসরণ করছিল? ইসাবেলের সঙ্গে পীয়েরের সম্পর্ক কি? আর বাক্সটা? ইসাবেল কি কোনো একসময়ে এই বাক্সটা গাড়িতে রেখে গিয়েছিল?

সেদিন রাত সাড়ে এগারোটার দিকে একটা ফোন এলো, আমি সবে শুতে গিয়েছি মাত্র। কাউন্টি হাসপাতাল থেকে ফোন।

হ্যালো, ওপাশে নারী কণ্ঠস্বর, আমি কাউন্টি হাসপাতাল থেকে বলছি, পীয়ের লাবন্তিয়ে নামে কাউকে আপনি চেনেন?

লাবন্তিয়ে কি তাহলে পীয়েরের পদবি? আমি বললাম, পীয়ের নামে আমি একজনকে চিনি।

পীয়েরের একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। এখন ইমার্জেন্সিতে আছে, মহিলা বললেন। দুর্ঘটনা? কী ধরনের দুর্ঘটনা? আমি শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। বেল্টওয়েতে (বেল্টওয়ে হচ্ছে ওয়াশিংটন শহরের চারদিকে ঘেরা মোটর পথ) একটা ট্রাকের সঙ্গে তার গাড়ির ধাক্কা লেগেছে, আপনি কাউন্টি হাসপাতালের রিসেপশনে যোগাযোগ করবেন। এই বলে মহিলা ফোন ছেড়ে দিলেন।

পীয়েরের দুর্ঘটনা হয়েছে, কিন্তু ইসাবেল কোথায়? হাসপাতালই-বা আমার নম্বর পেল কোথা থেকে? পীয়েরের কি জ্ঞান আছে? পীয়ের কি আমার নম্বর নার্সকে দিয়েছে? ইসাবেলও নিশ্চয়ই আহত হয়েছে, নইলে সেই তো আমাকে ফোন করত। ভাবলাম সকালে কাজে যাওয়ার আগে হাসপাতালে যাব।

টেলিভিশনে দেখলাম আটলান্টিকের নিম্নচাপ বিশাল ঝড়ের রূপ নিয়ে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের দিকে এগুচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বের স্টেটগুলোতে প্রবল তুষারপাতের সম্ভাবনা আছে। ভেবেছিরাম সে রাতে তুষার ঝড়ের স্বপ্ন আমি দেখব না, নীল বাক্সকে রেখে এসেছি ল্যাবে। কিন্তু সে রাতে দেখলাম ট্রেনের স্বপ্ন। আমার অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই রেললাইন, সেই লাইনটা কোথায় যায় জানতাম না, তবে গভীর রাতে মালগাড়ির শব্দ পেতাম। ঐ শব্দ আমাকে নিয়ে যেত ছোটবেলার স্মৃতিতে, আমার মফস্বল শহরের ছোট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, পথের পাঁচালীতে রেলের সাথে অপু আর দুর্গার ছোটাতে। সেই রাতের স্বপ্নে আমি বসে ছিলাম এক ট্রেনের ছাদে, তুষার ঝড়ের মাঝে। আমার চোখে-মুখে ছাট লাগছিল বরফের গুঁড়োর, ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল নাক ও কান। রেললাইনের দু-পাশে ছিল উত্তর অক্ষাংশের বন, দেখতে পাচ্ছিলাম ঐ বন ছড়িয়ে ছিল দিগন্ত পর্যন্ত। আমার ট্রেন যাচ্ছিল উত্তর মেরুতে।

দিন ৬. ওয়াশিংটন

সকাল ছিল কুয়াশায় ঘেরা, গেলাম হাসপাতালে। পীয়ের তখনও ইনটেনসিভ কেয়ারে। রিসেপশনে নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল। নার্স বিস্তারিত কিছু জানে না, সে শুধু জানে যে পীয়ের মাথায় ও বুকে খুব আঘাত পেয়েছে, ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ডাক্তাররা রাতেই অপারেশন করেছে, এখনও বলা যাচ্ছে না সে সুস্থ হবে কিনা। জিজ্ঞেস করলাম, আর কেউ কি ছিল পীয়েরের সাথে? নার্স তা জানে না। পুলিশের রিপোর্টটা কী করে পাওয়া যাবে? নার্স আমাকে রেকর্ড ঘেঁটে একজন পুলিশ সার্জেন্টের নাম ও তার টেলিফোন নম্বর দিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম পীয়েরের কোনো বন্ধু দেখা করতে এসেছিল কিনা। সে বলল, তার ডিউটির সময় কেউ আসেনি। দূর থেকে পীয়েরকে দেখলাম, শুয়ে আছে অচেতন। কি হয়েছে তোমার, ভাবলাম আমি, আর তোমার বন্ধু ইসাবেল? কোথায় সে এখন?

কাজে এসে যতীনকে পীয়েরের দুর্ঘটনা ও ইসাবেলের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা বলাতে

সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, সে পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পায়। যতীনকে ঠাট্টা করে বললাম, শোনো যতীন, বাংলা ভাষার অনুরাগী হিসেবে তুমি এটার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। বাংলায় ষড়যন্ত্রের মানে হচ্ছে ছটি যন্ত্রের কূটচাল। আমি তো ছ'টা যন্ত্র দেখছি না, যতীন বলল। ক'টা যন্ত্র তুমি দেখছ? যতীন উত্তর দিল চারটা— পীয়ের, ইসাবেল (শেলফের দিকে হাত দেখিয়ে বলল) ওই বাক্স, আর...। আর কি, জিজ্ঞেস করি আমি। আর তুমি, অবশ্যই, বলল যতীন। হাসলাম আমি, আমার ভূমিকা কোথাও আছে নিশ্চয়।

নার্স যে পুলিশ সার্জেন্টের ঠিকানা দিয়েছিল তার নাম ছিল ফ্রেড কম্পটন, তাকে ফোন করলাম। কম্পটন ফোন ধরল। তার কথা থেকে বুঝলাম বেন্টওয়ের ওপর পীয়েরের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা বড় ট্রাককে আঘাত করে। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ। পীয়েরকে যাত্রীর আসনে পাওয়া গেছে, চালকের আসনে নয়। তবে পীয়েরের সিট বেল্ট পরা ছিল না, কম্পটনের ধারণা পীয়ের চালকের আসন থেকে ছিটকে এসে পড়েছে যাত্রীর আসনে। গাড়িতে আর কোনো যাত্রী ছিল না। গাড়ির লাইসেন্স কানাডার ওন্টারিও প্রদেশের, পীয়েরেরই গাড়ি কিনা সেটা তারা এখনও নির্ধারিত করতে পারেনি, তবে তার ওন্টারিও থেকে শিগগির খবর পাবে বলে আশা করছে।

আমি ফোন ছেড়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। গাড়িটা যে ইসাবেলের তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু ইসাবেল কোথায়? দুর্ঘটনায় সাথে সাথে সে কেমন করে উধাও হয়ে গেল? কেনই-বা উধাও হয়ে গেল?
কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে রিপোর্ট এল আমাদের রহস্যজনক বাক্সটি টাংগস্টেন দিয়ে তৈরি। তবে মাস স্পেক্ট্রোমিটারের ফলাফল দেখাচ্ছে যে বাক্সটির উপাদান সবটুকুই টাংগস্টেন তা নয়, মনে হচ্ছে টাংগস্টেন থেকেও অনেক ভারি উপাদান তার মধ্যে আছে। সেই উপাদানের পারমাণবিক নম্বর ১০০-র অনেক ওপর। সে কী সম্ভব? আমি যতীনের দিকে তাকাই, যতীন দু'হাত দিয়ে মাথা ঘষতে ঘষতে ঘরের অন্যদিকে হেঁটে যায়। কী জটিল ব্যাপার, আ.! সে বলে, এ যে অসম্ভব ঘটনা, এত ভারি কোনো স্থিত উপাদান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, বিজ্ঞান সেটা হতে দেবে না, ধনাত্মক চার্জের প্রোটন একে অপরকে বিকর্ষণ করবে।

পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জের প্রোটন ও শূন্য চার্জের নিউট্রন দিয়ে তৈরি। কোনো উপাদানের পারমাণবিক নম্বর হচ্ছে তার প্রোটনের সংখ্যার সমান। প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গেলে নিউক্লিয়াস হবে খুবই অস্থিত, কারণ ধনাত্মক চার্জের বিকর্ষণ বল বেড়ে যাবে।

তাই প্রকৃতিতে ভারি পারমাণবিক নম্বরের মৌলিক উপাদান তেজস্ক্রিয় হয়।

রেগে বললাম, একি কল্পকথা নাকি? সায়েন্স ফিকশন? এ কিছুই নয়, ওরা স্পেক্ট্রোমিটার ল্যাবে ভুল করেছে, আবার পরীক্ষা করতে হবে। যতীন এবার কিছু না বলে তাক থেকে বাক্সটা নামিয়ে আনে। আধো অন্ধকার ঘরে বাক্সের ফ্লুরোসেন্ট নীল রঙ আমাদের রঙিন করে তোলে, আমরা বুঝতে পারি না ঐ আলোর উৎস কী? তেজস্ক্রিয়তা, বৈদ্যুতিক আলো নাকি কোনো অনাবিষ্কৃত শক্তি? ভ্যাকুয়াম বা পরমশূন্যতা থেকে আহরিত শক্তি? মনে হয় সেই নীল আলো স্পন্দিত হতে থাকে, আমি আবার ধীরে ধীরে সম্মোহিত হতে থাকি, কিন্তু যতীন বাক্সের একটু ওপর দিয়ে, এক সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে— হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করে। আর বাক্স যেন ঐ ভঙ্গির উত্তরে মুহূর্তে তার রঙ নিভিয়ে দেয়— আমার সম্মোহন ভেঙে যায়। আশ্চর্য হয়ে যতীনের দিকে তাকাই, কিন্তু যতীন তার কাঁধ ঝাঁকায়, অর্থাৎ এই ঘটনার অর্থ সে জানে না। যতীন আবার স্পর্শ করে বাক্স, নীল রঙ ফিরে আসে। আমার মনে পড়ে ভারমন্টের অভিজ্ঞতা, বাক্স বুঝেছে আমাদের উপস্থিতি।

এমন সময় ফোন বাজল। ল্যাবের আলো জ্বালিয়ে ফোন ধরলাম— ইসাবেল।

ইসাবেল, এসবের মানে কি? আপনি জানেন পীয়ের কি অবস্থায় আছে?

শুনুন, ইসাবেল বলে, আপনাকে ফোনে এত কথা বলতে পারব না। আমি যা করেছি সেটা পীয়েরের ভালোর জন্যই করেছি। আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?
আমি বললাম পাঁচটার আগে কাজ থেকে বের হতে পারব না। ইসাবেল বলল, শুনুন, আমাদের হাতে সময় খুব কম, আর আমি গাড়ি ছাড়া খুব বেশি জায়গায় যেতে পারব না। আপনি কি সাড়ে চারটার সময় এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়ামের সামনে দেখা করতে পারবেন?

শীতের সময়, সাড়ে চারটার মধ্যে অন্ধকার হয়ে আসে। ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট আয়তক্ষেত্র মাঠ, যাকে বলে মল, তার একদিকে ক্যাপিটল—যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ, আর অন্যদিকে সুউচ্চ ওয়াশিংটন মনুমেন্ট। মাঠের দুপাশে বিভিন্ন জাদুঘর— আর্ট মিউজিয়াম, প্রাকৃতিক ইতিহাসের মিউজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের মিউজিয়াম। এসব মিউজিয়াম চালাচ্ছে স্মিথশনিয়ান ফাউন্ডেশন। বিজ্ঞানী জেমস স্মিথশন, যার জন্য আজ এই জ্ঞানের উৎসব, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বসে তাঁর সব সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন ভাইপো হেনরি ডিকিনসনকে। ১৮২৬ সালের উইলে স্মিথশন লিখেছিলেন ভাইপো হেনরি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান, তবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাবে ওয়াশিংটন শহরে

স্মিথশনের নামে একটা ইনস্টিটিউট তৈরিতে যে প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে জ্ঞানের বিকাশ ও প্রচারের জন্য কাজ করবে। তাই হলো। ১৮৩৫ সালে স্মিথশনের ভাইপো সন্তানহীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর তাঁর সম্পত্তি— তখনকার দিনের পাঁচ লক্ষ ডলার— যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়। অথচ স্মিথশন কোনো দিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেননি, এমনকি তাঁর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বড় কারোর সঙ্গে কোনো পত্রালাপও ছিল বলে জানা যায়নি। অনেকে বলেন, তখনকার ব্রিটেনের কঠোর সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্মিথশনের এটা ছিল এক ধরনের প্রতিবাদ। স্মিথশন ছিলেন জারজ সন্তান এবং তখনকার ব্রিটেনের আইন তাঁকে তার পিতৃনাম ব্যবহারের সুযোগ দেয়নি। কেউ বলেন, স্মিথশনিয়ান ফাউন্ডেশন গড়ার পেছনে এই যে দান তা স্মিথশন যে শিক্ষা, গণতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তারে বিশ্বাসী ছিলেন তারই প্রতিফলন।

স্পেস মিউজিয়ামের বিশাল দালানের সামনে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে স্মিথশনের ইতিহাস মনে করার চেষ্টা করছিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে পীয়ের আর ইসাবেলের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে দিল না। পীয়ের এক অভিযানের কথা বলেছিল, সেই অভিযানের শুরু শীতের দেশে, এই অভিযানে আমি এক অনিচ্ছুক সহযাত্রী, কিন্তু সেই স্বপ্নের হিমবাহের স্রোতে পীয়ের আজ তলিয়ে যাচ্ছে। এমনকি হওয়ার কথা ছিল? ইসাবেলের কাছে নিশ্চয়ই এর উত্তর আছে? অন্ধকার হয়ে এল, ঐ অন্ধকারে দেখলাম মলের মাঠ পার হচ্ছে ইসাবেল, হেঁটে নয়, দৌড়ে। কালো কোট আর কালো চুলে তাকে প্রায় দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু তার পরই দেখলাম—দূরের গাড়ির আলোর ছটায়—ইসাবেলের দশ-বারো মিটার পেছনে দৌড়াচ্ছে বাদামি ওভারকোট আর হ্যাট পরা একজন পুরুষ। ইসাবেল সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়, সে চাপা স্বরে চিৎকার করে ওঠে, ভেতরে ঢুকে পড়ুন, ভেতরে ঢুকে পড়ুন। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল শ্লথ, অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না ইসাবেল সিঁড়ির ওপরে উঠে এল। বাদামি ওভারকোট ততক্ষণে সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেছে। আমি ইসাবেলের হাত ধরে মিউজিয়ামের মধ্যে দৌড়ে ঢুকলাম (স্মিথশনিয়ান মিউজিয়ামে ঢুকতে টিকিট লাগে না), মুহূর্তের জন্য ফিরে দেখলাম সেই লোকও আমাদের পিছু পিছু ঢুকছে।

ইসাবেল আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। আমরা দৌড়ালাম রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের ১৯০৩ সালের প্রথম বিমানের মডেলের নিচ দিয়ে, ফেলে আসলাম লিন্ডেনবার্গের, ১৯২৭ সালে আটলান্টিক পাড়ি দেয়া—স্পিরিট অব সেন্ট লুইস, প্রথম শব্দের গতিবেগকে অতিক্রম করা ১৯৪৭ সালের বেল এক্স-১ বিমান, ১৯৫৭-র প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক ১-এর মডেল, মঙ্গল গ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাকাশযান ১৯৭৬ সালের ভাইকিং ল্যান্ডার, ১৯৮৩ সালের উৎক্ষিপ্ত পাইওনিয়ার ১০-এর মডেল (সেই দিন পাইওনিয়ার ১০

সৌরজগতের শেষ সীমা দিয়ে চলেছিল)। আমরা দৌড়ে উঠলাম দোতলায়, চাঁদে অবতরণ করেছিল যে লুনার ল্যান্ডার তার একটা প্রমাণসই মডেলের পেছনে আমরা লুকালাম। টুপি পরা লোকটাও ঘরে এসে ঢুকল, আশপাশে তাকাল, কিন্তু আমাদের দেখতে পেল না। ইসাবেল আমার হাত খুব শক্ত করে ধরল, তারপর ফিসফিস করে বলল, এর থেকে খুব সাবধান, এ খুব বিপজ্জনক লোক, একে অবশ্যই এড়িয়ে চলবেন।

অথচ লোকটাকে দেখে মনে হল না সে কোনো আততায়ী— ছয় ফুট লম্বা, তীক্ষ্ণ থুতনি, সচেতন তীক্ষ্ণ চাহনি, টুপির নিচে ছাঁটা বাদামি চুল। সে আমাদের দেখতে না পেয়ে পরের ঘরটাতে ঢুকে গেল। এই সুযোগে লুনার ল্যান্ডারের ঘর থেকে বের হয়ে প্রধান দরজা দিয়ে মিউজিয়ামের বাইরে চলে এলাম।

বাইরে তখন রাত। ইসাবেলকে নিয়ে ছুটলাম যেখানটাতে গাড়ি পার্ক করেছিলাম। ছুটতে ছুটতে শুধু বলতে পারলাম, এসবের মানে কি? ইসাবেল উত্তর দিল, আমি সব বলব, কিন্তু আগে কোনো নিরাপদ জায়গায় চলুন। বাদামি কোটকে আর কোথাও দেখলাম না, তবু দেরি না করে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। শহর-কেন্দ্র ছেড়ে আমরা চললাম উত্তরে। বললাম, আমাদের পিয়রের কাছে যেতে হবে, সারাদিন ওর খোঁজ নিতে পারিনি। ইসাবেল চুপ করে রইল। পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ ছেড়ে জর্জিয়া অ্যাভিনিউতে গাড়ি ঢুকলে সে বলল, আমরা হাসপাতালে যেতে পারব না। ছ'টাও বাজেনি, অথচ ওয়াশিংটনের রাস্তায় কোনো লোক নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ইসাবেল বলল, সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক। বিপজ্জনক? বাদামি কোট কি পীয়েরের হাসপাতালে যাবে? ইসাবেল যেন আমার অনুচ্চারিত ভাবনাকে শুনতে পেয়ে বলল, সে আমার জন্য ওখানে ওত পেতে আছে। সে কে সেটা আমি জিজ্ঞেস করি না, ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয় বাদামি কোট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইসাবেল, গাড়ি ঢোকে বেল্টওয়েতে। ইসাবেল কথা বলে, পীয়েরকে দেখে যা মনে হয় পীয়ের আসলে তা নয়। পীয়ের ছিল একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, তার কিছু গবেষণা ও উদ্ভাবন সভ্যতাকে বদলে দিতে পারত। কিন্তু সভ্যতা যদি না বদলাতে চায় তাহলে সেই উদ্ভাবনের কোনো মূল্য নেই। আর পুরো ঘটনাটা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করা কঠিন হবে, এর জন্য সময় দরকার। আপনি আজ রাতটুকুর জন্য কি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে দেবেন? আমার কাছে এই শহরের অন্য যে কোনো জায়গা বিপজ্জনক।

ইসাবেলের অনুরোধ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি তখনও স্পেস মিউজিয়ামের অ্যাডভেঞ্চারের রেশ থেকে মুক্ত হইনি, পীয়েরকে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বলে ভাবার চেষ্টার

মধ্যেই ইসাবেলের অনুরোধ আমাকে অপ্রস্তুত করে দিল; কিন্তু তাকে না করে দেয়ার মতো কোনো সঙ্গত কারণ ঐ মুহূর্তে খুঁজে পেলাম না। মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই।

বাসায় পৌঁছে ইসাবেলকে বসার ঘরে রেখে টেলিফোনের আনসারিং মেশিনে কেউ মেসেজ রেখেছে কিনা তা শুনতে গেলাম। হাসপাতাল থেকে মেসেজ ছিল: পীয়ের লাবন্তিয়ে আজ বিকেল চারটায় মারা গিয়েছে।

বসার ঘরে ছুটে এলাম। পীয়ের মারা গেছে। ইসাবেল প্রথমে অবোধের মতো আমার দিকে তাকাল, তারপর তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। আমাদের এখনই যাওয়া দরকার, কোনো রকমে বললাম আমি। কিন্তু ইসাবেল কোনো উত্তর দিল না, সে শূন্য দৃষ্টিতে বড় জানালার ওপাশে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রিইল। পীয়েরের এখানে ইসাবেল ছাড়া আর কেউ নেই, ইসাবেল নিশ্চয়ই জানে এখন কি করা দরকার। পীয়েরের অভিযান শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমার অভিযান কি শেষ হবে এখন? আমার মনে পড়ল সেই ঠাণ্ডা তুষারের সকালে কবরস্থানে আমাকে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত পীয়েরের মুখ, সে চিৎকার করে বলেছিল, কেমন আছ তুমি?

মিনিটখানেক চুপ করে বসে থাকার পর ইসাবেল বলল, শুনুন, আমরা হাসপাতালে যেতে পারব না। যে কারণে আমরা আগে যেতে পারিনি, সেই একই কারণে আমরা এখনও যেতে পারব না। কিন্তু পীয়েরের কী হবে? ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করি। পীয়েরের মৃত্যুতে ইসাবেলের প্রতিক্রিয়া আমি বুঝতে পারি না।

পীয়েরের আর কোনো সাহায্য প্রয়োজন নেই, কারণ সে এখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তবে পীয়ের যে কাজ শুরু করেছিল সেটা আমাকে শেষ করতে হবে। এই বলে আজ সকালের মতো ইসাবেল সোফা ছেড়ে উঠে বড় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জানালায় তার আবছা প্রতিফলন দেখা যায়। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে ইসাবেল বলে, বাইরে থেকে কি আমাদের দেখা যাচ্ছে. আ.?
এই প্রথম ইসাবেল আমার নাম ধরে ডাকল। বললাম, হতে পারে, তবে কেউ আমাদের দেখবার জন্য নিশ্চয়ই বাইরে বসে নেই। ইসাবেল মনে হয় হাসল, তুমি কি সেটা নিশ্চিত জান? ইংরেজি ভাষায় তুমি-আপনির বালাই নেই, তবু যতক্ষণ না ইসাবেল আমার নাম ধরে ডেকেছে আমি ভেবেছি আমাদের কথোপকথন চলেছে আপনিকে অবলম্বন করে, আর এখন ভাবলাম সে আমাকে সম্বোধন করছে তুমি বলে।

ইসাবেল বলে, আমরা মহাবিশ্বকে দেখি সীমিত মাত্রায়, জানালার ওপারে কিছু আছে বলে

আমরা মনে করি না। অথচ এমন হতে পারে জানালার ওপারে আমার যে প্রতিফলন সেইরকম আর একজন, আর একজন ইসাবেল—এমনি করে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না? এমনকি হতে পারে আমাদের এই মহাবিশ্বের সমান্তরাল একটা জগৎ আছে, তাকে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, সে থাকবে আর একটি মাত্র বা ডাইমেনশনের অন্তরালে, যে মাত্রা খোলার সমীকরণটা জানলে সে হতো আমাদের প্রতিবেশী।

কে হতো আমাদের প্রতিবেশী? ভাবি। সমান্তরাল জগৎ? পীয়েরের মৃত্যুতে ইসাবেলের অসংলগ্ন কথায় আশ্চর্য হই না, তবু তার কাছ থেকে সমান্তরাল পৃথিবীর কথা আমি আশা করিনি।

ইসাবেল ততক্ষণে জানালা থেকে সরে এসে দেয়ালে ভ্যান গ'র নক্ষত্রের রাত ছবিটা দেখছে, নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণি। ইসাবেল বলে, পীয়ের আর আমি অনেক পথ হেঁটেছি, আর এখন আমি ক্লান্ত। বাকি পথটা পাড়ি দিতে পারব কিনা জানি না। আ., তুমি ভেবেছ আমি আর পীয়ের ফরাসিভাষী। আসলে তুমি আমাদের ফরাসি উচ্চারণে কি দোষ, ব্যাকরণে কি দোষ ধরতে পার নি। আমরা আসলে কানাডা থেকে আসছি না।

চুপ করে রইলাম। কানাডার লোক না হলে তারা ইউরোপের লোক হবে, কিন্তু আমি ইসাবেলকে কথা বলতে বাধা দিলাম না। তারপর ইসাবেল বলল, তোমার কাছে সেই বাক্সটা আছে এখনও?

আশ্চর্য হলাম না, এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল, তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম, কোন বাক্স? ইসাবেল বলল, ফ্লুরোসেন্ট নীল বাক্স। আমার এবার মনে পড়ে আধো ঘুমে কবরস্থানে দেখা হুড দিয়ে ঢাকা উপবৃত্তাকার মুখ, ইসাবেল কি সেখানে ছিল? জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেমন করে জানলে বাক্সটা আছে আমার কাছে?

বাক্সটা আমরাই রেখেছিলাম, ইসাবেল বলে; কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই। আমি যা বলব এখন তুমি তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু; আ., ঐ বাক্সটা আমার চাই। বাক্সটা পীয়েরের দরকার ছিল, পীয়ের পুরোপুরি তা বুঝতে পারে নি, তবে এখন ওই বাক্স হচ্ছে আমার ফিরে যাওয়ার চাবিকাঠি।

কোথায় ফিরে যাবে ইসাবেল? সমান্তরাল বিশ্বে?

আমার মনের কথাটা ধরতে পেরে যেন ইসাবেল হাসল। হাসিতে বিষাদের ছোঁয়া ছিল। শোনো আ., ইসাবেল বলে, কত দিন কত বছর কেটে গেছে তুমি ভেবেছ এই ধরাছোঁয়ার বাইরে কী আছে, ভেবেছ স্থান-কালের এই চক্রের বাইরে কী আছে? আর আজ যদি সেই সুযোগ তোমার কাছে আসে তুমি কি তা ফেলে দেবে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ইসাবেলের দিকে। তার কথা নয়, তার কণ্ঠের দৃঢ়তা আমাকে আশ্চর্য করে। তার পরই ইসাবেল বলে, পীয়ের আর আমি এই পৃথিবীর লোক নই, আ.। আমি ধরে নিলাম ইসাবেল আধ্যাত্মিক কথা বলছে– এই পৃথিবীর লোক নই মানে তারা আলাদা ধরনের মানুষ, সাধারণ মানুষের চরিত্র থেকে তাদের চরিত্র ভিন্ন। পীয়েরকে যে রকম পাগল পাগল দেখেছি তাতে ইসাবেলের কথায় আশ্চর্য হলাম না।

কিন্তু এর পরই ইসাবেল বলে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না আ., আমি আর পীয়ের অন্য এক মহাবিশ্বের লোক।

আমাকে অনেকে বলে আমি নাকি বাস্তব বা রিয়ালিটিকে সব সময় ধ্রুব বলে মানি না। আমার অবশ্য সেটা মনে হয় না। কিন্তু আমি পড়েছি কোয়ান্টাম বা অতি ক্ষুদ্র জগতে নাকি আমাদের দৈনন্দিন যুক্তি কাজ করে না, সেই অর্থে কোয়ান্টাম বাস্তবতা আমাদের বড় জগতের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। সেই অর্থে আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বাস্তবতার বাইরে অন্য একটা যুক্তি বা বিজ্ঞান কাজ করতে পারে। শীতের রাত্রিতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ইসাবেলের বক্তব্য আমার কাছে প্রথমে মনে হয়েছিল আমাদের জগতের কোয়ান্টাম বাস্তবতার সাথে যুক্ত। আমার সেই ধারণা মুছে গেল তার পরের কথাতে। ইসাবেল বলল, যে মহাবিশ্বে তোমাদের বাস তার নাম আমরা দিয়েছি 'ম' মহাবিশ্ব, আর আমরা আসছি 'ক' মহাবিশ্ব থেকে।

ইসাবেলের দিকে তাকালাম, চুপ করে রইলাম। বিভিন্ন মানুষের চরিত্রে ভিন্নতা রয়েছে, একেক মানুষ একেক ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে। তাই তো পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য।

ইসাবেল আমার মৌনতাকে অগ্রাহ্য করে বলতে থাকল, আমাদের পৃথিবীর আকাশ কোটি সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, এই আলো আমাদের অন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা গোটা গ্যালাক্সিকে জয় করেছি, ভেবেছিলাম অসীম শক্তিকে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু মহাকর্ষের কাছে আমরা হেরে গেছি। 'ক'র মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আশ্রয়স্থল, তাদের বর্তমান জীবন স্থান-কালের ক্রূর বক্রতায় দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই আ.।

আমি কোনো এক দূরবর্তী অতীতে স্বপ্ন দেখেছিলাম এক প্রসারিত প্রান্তরের যার ওপর ভেসেছিল অসংখ্য উজ্জ্বল গোলক এবং প্রতিফলিত উষ্ণ আলোয় বায়ুমণ্ডল ঝলকাচ্ছিল এক চোখ ধাঁধানো শুভ্রতায়। সেই প্রান্তরে রাত্রি বলে কোনো বোধ ছিল না, আলো শুষে নিয়েছিল জলের নিরাপত্তা। অনেক পরে বুঝেছিলাম ঐ প্রান্তরে সমস্ত জীবন ছিল অন্তর্হিত, সব পাথর গুঁড়িয়ে গিয়েছিল মিহি বালির দানায় যা উড়ে যাচ্ছিল গরম বাতাসে দীপ্ত আকাশ। বহু বছর পরে ইসাবেলের ইশারায় সেই স্বপ্নের স্মৃতি সাঁতরে ওঠে ফ্লুরোসেন্ট বাক্সের স্বপ্নের ওপর।

গ্যালাক্সিরা সব ছুটে আসে এক বিন্দুতে, ছোট হয়ে যাচ্ছে 'ক' আমাদের চোখের সামনে, ইসাবেল বলে। মহা-সঙ্কোচন।

জানালার বাইরে তুষার পড়তে আরম্ভ করে, আটলান্টিকের ঝড় এসে গেল। ইসাবেলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি না। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন হোস্টেলে আমার কক্ষসঙ্গী ছিল পদার্থবিদ্যার এক ছাত্র। মনে পড়ে তার কাছে আর এক বন্ধু আসত, যে দাবি করত যে সে মধ্যাকর্ষণ বল ও স্থান-কালের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে, যা আইনস্টাইনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এ রকম অনেকেই আসত প্রতি বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাদের আবিষ্কার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হতো। কিন্তু ইসাবেল কোনো আবিষ্কারের কথা বলছিল না, ইসাবেলের ছিল একটা কাহিনী, একটা অনন্ত মহাকাশের কল্পনা, এক বিধ্বস্ত স্বপ্নের বর্ণনা।

ইসাবেল বলে তার স্বপ্নের কথা। শোনো আ., তুমি জানো তোমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণ হচ্ছে, একটা গ্যালাক্সি আরেকটা গ্যালাক্সি থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। স্থানের পরিমাণ বাড়ছে 'ম' মহাবিশ্বে। কিন্তু 'ক'র সময় ফুরিয়ে গেছে। ইসাবেল আবার ফিরে যায় জানালার কাছে, আঙুল দিয়ে জানালার কাচে ঘনীভূত হিমে দাগ কাটে। ইসাবেল আঁকে এক চিহ্ন, কোথায় দেখেছি আমি ঐ চিহ্ন? মনে পড়ে এক লাইব্রেরি, ঘুরপাক খাওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশে, অসংখ্য তাকে সাজানো অসীমসংখ্যক বই। একটা বই আমার মনোযাগ আকর্ষণ করেছিল, জ্বলজ্বল করছিল সেই চিহ্ন বইটির মলাটে সোনালী রঙে।

ইসাবেল বলে, আমাদের সভ্যতা অতি প্রাচীন, কত প্রাচীন তা তোমাকে বলতে পারব না, সময়ের হিসাব আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সময়কে জয় করতে গিয়ে আমরা এমন এক অতীতে ফিরে গেছি যার বর্বরতায় আমরা মোহমান।

হঠাৎ আমার মনে হয় ওই কাচের জানালার বাইরে পৃথিবী বলে কিছু নেই, নিঃসঙ্গ বাতাসে

তুষার ভেসে আসে মহাশূন্যের শেষ প্রান্ত থেকে। অসীম স্থানে আমার ঘর যেন এক মহাকাশযান। আজ সন্ধ্যায় মিউজিয়ামে ইসাবেলের অনুসরণকারীর হাত থেকে পালানোর সময় আমি ভীত হইনি, তবে কেন জানি এখন শিউরে উঠি। ইসাবেলের কথা আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করার কোনো কারণ আমার ছিল না; কিন্তু আমার মনে হয় পীয়েরের ভাগ্য; পীয়েরের মৃত্যু—কোনো দুর্ঘটনা নয়। অ্যাপার্টমেন্টের হিটার ঘরের ঠাণ্ডাকে দূর করতে পারে না।

ইসাবেল ভয়ের কথা বলে না। ইসাবেল বলে এক কাল্পনিক সভ্যতার প্রাচীনতার কথা, যে সভ্যতাকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলবে টাইপ-৩ সভ্যতা। টাইপ-৩ সভ্যতা একটা গ্যালাক্সির বিশালসংখ্যক নক্ষত্রের শক্তি আহরণ করতে পারে। সেই হিসেবে আমাদের সভ্যতা হচ্ছে টাইপ-০, যা কিনা অগ্রগতির প্রথম সোপানে দাঁড়িয়ে আছে। টাইপ-১ সভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার আবহাওয়া ও ভূমিকম্প, ভ্রমণ করতে পারে তার গ্রহের গভীরে, বাস করতে পারে সমুদ্রতলে। টাইপ-২ ছাড়িয়ে যাবে টাইপ-১-এর কীর্তিকে, নিয়ন্ত্রণ করবে সূর্যকে। ইসাবেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু টাইপ-৩ হয়েও আমরা স্থানকালের পরিণামকে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না, আমাদের হিসেবে আগামী কয়েক লাখ বছরের মধ্যে স্থান-কালের শেষ সঙ্কোচনে আমাদের সভ্যতার মৃত্যু হবে, গ্যালাক্সির সবগুলো নক্ষত্রের শক্তিও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। তাই গত কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন একটা উপায় খুঁজছে, যাতে আমরা 'ক' মহাবিশ্ব থেকে পালাতে পারি।

বাইরের তুষারপাতের সাথে সাথে গত সকালের কালো ওভারকোট পরা দৃঢ় রহস্যময়ী ইসাবেল হয়ে ওঠে ভঙ্গুর। তার কণ্ঠের আকুলতা আমাকে স্পর্শ করে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করি না। পীয়েরের কথামত এই অভিযানের শেষ নেই, ইসাবেলের কাহিনী সেই অভিযানের অংশ। তবু হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে পীয়েরের প্রাণহীন দেহের কথা ভুলতে পারি না, ভাবি ইসাবেলের কাহিনী হল মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া। ইসাবেলের কথা শুনতে শুনতে রান্নাঘরে ঢুকি কফি বানাতে।

রান্নাঘর থেকে ইসাবেলকে দেখতে পাই না, তার গলার স্বর ভেসে আসে বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্য থেকে। ইসাবেল বলে, এই সময়ই পীয়েরের আবির্ভাব। আমাদের ধারণা ছিল আমাদের মহাবিশ্ব আপাতদৃষ্টিতে ত্রিমাত্রিক হলেও তার মাত্রার সংখ্যা অনেক বেশি। তোমাদের পদার্থবিদ্যার স্ট্রিং তাত্ত্বিকরা এসব এখন বলছেন। এসব মাত্রা নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব অন্য সব মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে আছে, যেমন তোমাদের মহাবিশ্বের সাথে অন্য মহাবিশ্বের কোনো যোগাযোগ নেই। স্থান-কাল বলতে আমরা যা বুঝি সেটা শুধু ওই

সব মহাবিশ্বেই রয়েছে, তার বাইরে নেই। কিন্তু প্রতিটি মহাবিশ্বের নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়মে কিছু মহাবিশ্বে প্রাণের আবির্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি মহাবিশ্বে রয়েছে উচ্চতর প্রাণের সম্ভাবনা। তবে বেশির ভাগ মহাবিশ্বে প্রাণ বা উচ্চতর সভ্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

কফি নিয়ে বসার ঘরে আসি। ইসাবেল কফির কাপটা নিয়ে সোফায় এসে বসে, তাকিয়ে থাকে কফির নিস্পন্দ তরল স্তরের দিকে। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে আবার বলতে থাকে, আমি বলেছি যে আমাদের বিজ্ঞানীরা আমাদের মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে ভ্রমণের কোনো উপায় খুঁজছিলেন। আমি জানি না তুমি জানো কিনা যে, তোমাদের অনেক বিজ্ঞানী ব্ল্যাক হোল বা কালো গহ্বরের মাধ্যমে অন্য বিশ্বে যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা করছেন, সেই গবেষণার কোনো প্রায়োগিক মূল্য নেই— কোনো ব্ল্যাক হোলের কাছে পৌঁছাতে মানুষের হাজার হাজার বছর কেটে যাবে, হয়ত মানুষ কোনো দিন পৌঁছাতে পারবে না সেখানে।

ইসাবেল কফি নিয়ে উঠে জানালার কাছে যায়। বলে, তুমি জানো ব্ল্যাক হোল হচ্ছে একটা বিশালাকায় নক্ষত্রের অন্তিম পরিণতি, তার মাধ্যাকর্ষণ বল এত বেশি যে এমনকি আলোও তার পৃষ্ঠ ত্যাগ করতে পারে না, যদিও আমরা সাধারণত পৃষ্ঠ বলতে যা বুঝি সেটা ব্ল্যাক হোলের নেই। তবে ব্ল্যাক হোলকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে হলে তোমাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্রকে মিলিয়ে যে বিজ্ঞান সেটা বুঝতে হবে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখনও সেই বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেন নি, তারা এখনও সেই বিজ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেয়ালঘড়ি রাত দশটা বাজার সঙ্কেত দেয়। ইসাবেল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে আ., আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, এসব কথা বিশ্বাস করার নয়, তবে সব কথা বলবার সময় আমাদের নেই। নীল বাক্সটা আমাদের চাই, সেটা নিয়ে আগামী ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার যেতে হবে ফ্লোরিডার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। আমাকে ফিরে যেতে হবে আমার 'ক' মহাবিশ্বে। আর ঐ বাক্সটাই শুধু আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে— suspension of belief— ছায়াছবি দেখতে গিয়ে আমাদের এটা করতে হয়, সাময়িকভাবে অনেক যুক্তিতর্ককে ভুলে যেতে হয়। suspension of belief হচ্ছে যুক্তিতর্কের প্রয়োগকে ছুটি দেয়া। মাস স্পেক্ট্রোমিটারের ফলাফল বলছে নীল বাক্সের গঠনে রয়েছে খুব ভারি এক উপাদান যার পারমাণবিক ভর

১৫০-এর ওপর— আমি কি সেটা বিশ্বাস করেছি? তবু সেই বাক্সের আবির্ভাব, তার গভীর ফ্লুরোসেন্ট রঙ, পীয়েরের স্থান-কালের রেখার সাথে আমার রেখার সমাপতন, ইসাবেলের কালো চশমা, স্পেস মিউজিয়ামে বাদামি ওভারকোট থেকে বাঁচা, পীয়েরের মৃত্যু— এসবের কোনোটাই কি স্বাভাবিক? আর প্রকৃতির পরিবর্তনের মাঝে তুষারের স্বপ্নে কে আমার সাহায্য চাইছে? ইসাবেল? সে কি আমাকে অনুরোধ করছে তাকে ফ্লোরিডা নিয়ে যেতে? জিজ্ঞেস করলাম, ইসাবেল! সেই বাদামি ওভারকোট পরা লোকটা কে ছিল?

বাইরের তুষার জানালার কাচের ওপাশ থেকে ইসাবেলের ত্বক স্পর্শ করে, শীতল শিহরণ থেকে বাঁচতে সে আড়াআড়িভাবে দুহাত রাখে দুই কাঁধে। দুহাতের বন্ধন তাকে সাহস দেয় কোনো এক বিভীষিকার স্মৃতি থেকে পালাতে; কিন্তু তবু তার বিস্ফারিত চোখে থেকে যায় অন্ধকারের আতঙ্ক— যে আতঙ্ক প্রতিফলিত হয় তার কথায়, এক আততায়ী ভ্রমণ করে মহাবিশ্ব থেকে মহাবিশ্ব, সভ্যতার মূল্য তার কাছে ক্ষণিক, শেষ উদ্দেশ্যের জন্য কোনো বাধাকেই সে মানবে না।

কথাগুলো বলতে ইসাবেলের কষ্ট হয়, তার কথায় বাদামি ওভারকোটের চরিত্র আমার কাছে পরিষ্কার হয় না। তবু ইসাবেলের আতঙ্কবোধ আমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে আমার অনেক প্রশ্ন করার ছিল, কিন্তু বাদামি ওভারকোটের প্রসঙ্গে না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নীল বাক্স আমার গাড়িতে কেমন করে এল? ঐ বাক্সের ভেতর কি আছে? প্রশ্ন দুটোয় ইসাবেল একটু যেন স্বস্তি পেল, সে হাসল। সচেতনভাবে আমরা তোমার গাড়ি বাছিনি, আ., ইসাবেল বলল। তুমি দয়া করে লোকজনকে শীতের মধ্যে গাড়িতে রাইড দাও। বলতে গেলে তোমার উদারতাই তোমাকে বেছে নিয়েছে। আর বাক্সের ভেতর কী আছে? বাক্সের ভেতর রয়েছে শুধুই শূন্যতা।

ইসাবেলের উত্তর আমার কাছে অবোধ্য থেকে যায়, কিন্তু সেই উত্তর বুঝে নেয়ার সময় ছিল না, আমরা বেরিয়ে গেলাম। বাক্সটা নিতে যখন ল্যাবে পৌঁছলাম তখন আটলান্টিক থেকে তুষার ঝড় এসে পড়েছে। ল্যাবের বিল্ডিংয়ের পেছনে গাড়ি পার্ক করলাম, এখানে সাধারণত পার্ক করা যায় না, তবে পাঁচ-দশ মিনিটের কোনো কাজ থাকলে এখানে পার্ক করি। ইসাবেলকে গাড়িতে বসে থাকতে বলে ভেতরে ঢুকলাম। অনেক রাতেই এখানে আসি কোনো বাড়তি কাজ শেষ করতে, তাই রাতের পাহারাদাররা আমাকে চেনে; কিন্তু আজ বড় অস্বস্তি হচ্ছিল—যেন চুরি করতে এসেছি, বাক্সটা নিয়ে পাহারাদারের সামনে আজ আমি পড়তে চাই না। তাই ল্যাবে ঢুকে আর আলো জ্বালালাম না, জ্বালাতে হলো না, একরঙা নীলাভ আলোয় মোহনীয় হয়েছিল ঘর। কিন্তু বাক্সটা নিতে নিতে জানালার বাইরে

চোখ পড়ল, নীল-লাল আলো জ্বালিয়ে তুষারপাতের মধ্যে একটা পুলিশের গাড়ি আমাদের কম্পাউন্ডে ঢুকছে। এই প্রথম আমাদের কম্পাউন্ডে পুলিশ দেখছি। পুলিশ কি আমাদের জন্যই আসছে? কে তাদের খবর দিয়েছে? ইসাবেলের সেই মহাজাগতিক আততায়ী? তার সঙ্গে পুলিশের কী যোগাযোগ থাকতে পারে? নাকি অন্য কিছু হয়েছে যার সঙ্গে আমার (বা আমাদের) কোনো সম্পর্ক নেই? যাই হোক না কেন এখন আমাকে অলক্ষে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

বাক্সটা নিয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাইরের করিডোরে ঢুকে বুঝলাম পাহারাদার গেছে দালানের সামনে পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলাম পাহারাদারকে এড়ানো গেল, পুলিশের হাত থেকে কি রক্ষা পাওয়া যাবে? বাইরে এসে দেখি পেছনে রাখা পাঁচটা গাড়ি তুষারে ঢেকে যাচ্ছে, আমার গাড়িটা তার মধ্যে আছে। গাড়িতে উঠে বাক্সটা পেছনের সিটে রেখে ইসাবেলকে বললাম, পুলিশ এসেছে, মাথা নিচু করে রাখ। আমিও নিচু হয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদেই পুলিশের গাড়িটা সার্চলাইট জ্বালিয়ে আসল। তুষারে আমাদের গাড়ির চাকার দাগ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তাই পার্ক করা অন্য গাড়িগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ ছিল না, যদিও আমাদের গাড়ির সামনের হুডে জমা তুষার সদ্য চালিত ইঞ্জিনের গরমে গলে যাচ্ছিল। পুলিশ পেছনে থেকে আমাদের গাড়ির ওপর আলো ফেলে চলে গেল।

ইসাবেলকে বললাম, এবার আমরা বাসায় ফিরে যাচ্ছি। ইসাবেল আমার হাত চেপে ধরল, আ., আমরা তোমার বাসায় এখন ফিরে যেতে পারব না, পীয়েরের মতো তোমারও জীবন সংশয় হবে। স্কাইলস তোমাকে বাঁচাতে দেবে না। ইসাবেলের গলায় ছিল এক বিপন্ন আকুতি। স্কাইলসই তাহলে বাদামি ওভারকোট, তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, স্কাইলাস কে ইসাবেল? আজ যে তোমার পিছু নিয়েছিল?

হ্যাঁ, জেরার্ড স্কাইল, আন্তর্মহাজাগতিক আততায়ী। গতকাল সে বেল্টওয়েতে তার গাড়ি দিয়ে আমার গাড়িকে পাশ থেকে ধাক্কা লাগিয়ে একটা ট্রাকের নিচে ঢুকিয়ে দেয়। পীয়ের মরে গেল, কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আমি নিশ্চিত সে তোমার বাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই আ., তুমি আমাদের জন্য ইতিমধ্যে অনেক করেছ, তোমার সাহায্যের ওপর একটা পুরো সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, আমি কোটি কোটি মানুষের কথা বলছি। আমি যদি আগামী ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ফ্লোরিডার একেবারে দক্ষিণে না যেতে পারি তবে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দিন ৭. ফ্লোরিডার পথে

সাত দিন হয়ে গেল কুইবেক ছেড়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছি। এখন চলেছি আরো দক্ষিণে, ফ্লোরিডার দিকে। পার হয়ে এসেছি ভার্জিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া। পথে তুষারপাতের বিরাম হয়নি, এই তুষার ঝঞ্ঝাকে অনেকে এই শতাব্দীর ঝড় বলে অভিহিত করেছে। গাড়ির রেডিওতে ক্রমাগত ঝড়ের জন্য সতর্কবার্তা দিচ্ছিল, লোকজনকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করছিল। রাস্তায় ছোট গাড়ি বিশেষ ছিল না, শুধু ছিল বড় বড় ট্রাক যারা আমার গাড়ির সামনের জানালায় তুষার আর বরফ ছিটিয়ে যাচ্ছিল, যার ফলে মাঝেমধ্যেই আমাকে রাস্তার ডানদিকে গাড়িটা দাঁড় করাতে হচ্ছিল; কারণ সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। টানা কুড়ি ঘণ্টা চালানোর পর গাড়ি থামিয়ে শুধু দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম।

কেন আমি ইসাবেলের প্রস্তাবে রাজি হলাম তার বোধহয় কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। মানুষ ঝোঁকের বসে জীবনে বহু কাজ করে যার পেছনে অনেক সময় কাজ করে কৌতূহল, জানার ইচ্ছা, অনেক সময় অ্যাডভেঞ্চারের তাড়না, অনেক সময় মোহ, অনেক সময় প্রেম। জানি না এর মধ্যে কোনোটা আমাকে ইসাবেলের অনুরোধে সায় দিতে বাধ্য করেছিল। যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মহাবিশ্বের মধ্যে যাতায়াতের কথা অসঙ্কোচে বলতে পারে সে কি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে? বাস্তবতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে যে ব্যাখ্যায় গড়ে তোলা যায় নিজস্ব এমন জগৎ, যা কিনা কাজ করে ভিন্ন এক অলীক নিয়মে। হয়ত বা ইসাবেলের কাহিনী একটা রূপক মাত্র যার অন্তর্নিহিত অর্থ নিতান্তই সাধারণ যা কিনা আমাদের পৃথিবীরই অংশ। তবু সেই ঝড়ের রাতে, নিজের জীবন বিপন্ন করে এক হাজার মাইল দূরে সুদূর ফ্লোরিডায় তাকে নিয়ে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? সে কী শুধু তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য?

ল্যাব থেকে বেরিয়ে আমরা আর বাসায় ফিরে যাইনি। প্রথমে বেল্টওয়ে, তারপর ৯৫ নম্বর হাইওয়ে ধরে আমরা ভার্জিনিয়া পার হয়ে যাই। সেখানে একটা পেট্রল স্টেশন থেকে যতীনকে ফোন করলাম। সে সবে শুতে যাচ্ছিল। আমি বলেছিলাম বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছি ফ্লোরিডায়, ইসাবেল আমার সাথে আছে। যতীন নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়েছিল, তবু তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণে সে আমাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে বলল, এই দুর্যোগে গাড়ি চালিও না, আ., পথে কোথাও থেকে যাও। থাকব, বলে ফোন ছেড়ে দিই।

রাস্তায় তুষার জমছে, সেখানে একটা গাড়িও নেই। হাইওয়েতেও গাড়ি খুব একটা ছিল না, তবে অনেক ট্রাক ছিল। ট্রাকের চাকা থেকে তুষার ছিটকে এসে সামনের কাচে পড়ে অদৃশ্য

করে দেয় বাইরের পৃথিবী, বাধ্য করে আমাকে গাড়ির গতি শ্লথ করতে, গাড়িকে রাস্তার ডানদিকে নিয়ে যেতে। যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, কিন্তু ইসাবেলকে পৌঁছাতে হবে ফ্লোরিডায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পেছনের সিটের ওপর নীল বাক্স পড়ে থাকে কোনো এক যান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। সে বুনে চলে এক স্বপ্নের রহস্য, আমি তা টের পাই রাস্তার সম্মোহনে যখন হঠাৎ হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্য চলে যাই গাড়ির বাইরের তুষারবর্তে। ঐ স্বপ্নে আমি আবার তুষার ঝড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। আমি পরে আছি শীতের কালো ওভারকোট, মাথায় পশমের কানঢাকা টুপি, হাতে পুরু দস্তানা, কিন্তু আঙুলের ডগা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আমার মনে পড়ে সেই ক্ষণিক স্বপ্নের মধ্যে আশা করছিলাম তুষার ছাড়া এক আকাশের, সেই সহস্র সূর্যের, কিন্তু ইসাবেলের কথায় সম্বিত ফিরে পাওয়ার আগে কে যেন আমাকে বলছিল, যাকে জানো না তাকে চেয়ো না।

জর্জিয়া পার হতে হতে তুষার ঝড় ক্রমশ কমে আসতে লাগল; কিন্তু ফ্লোরিডায় ঢুকতেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। শীতের সময় এখানে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আজকের রাত অন্য রাতের মতো নয়। আজকের রাত ইসাবেলের আর নীল বাক্সের রাত। জলের ধারায় পথ দেখা যাচ্ছিল না, বেশির ভাগ সময়ই আমি অগ্রগামী কোনো ট্রাকের পেছনের লাল বাতিগুলোকে সম্মোহিতের মতো অনুসরণ করছিলাম।

এছাড়া সম্মোহিত আমি ছিলাম ইসাবেলের কথায়, ইসাবেলের মহাবিশ্বের কাহিনীতে। 'ক' মহাবিশ্ব সাধারণ আমাদের মহাবিশ্বের (যাকে ইসাবেল বলছিল 'ম') নিয়মনীতিই মেনে চলে। এর মানে হচ্ছে আমাদের বিশ্বের জানামতে যে চারটি বল—মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ-চুম্বকীয়, শক্তিশালী আর দুর্বল—ঐ চারটি বল তাদের বিশ্বেও কাজ করে। কার্যকারণে তাদের পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি ও বিকাশ পৃথিবীর মতোই হয়েছে। ইসাবেল বলে, এটা অসম্ভব নয়, যদি অগণিত মহাবিশ্ব থেকে থাকে তাহলে তার মধ্যে দুটির এক রকম হবার সম্ভাবনা আছে। নিশ্চয়ই, আমি ভাবি। অসংখ্য বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে এই রকম সমান্তরাল বিশ্ব সম্পর্কে। অথচ, আমি ভাবি, সমান্তরাল বিশ্ব থাকতে পারে আমাদের এই গতানুগতিকতার মাঝেই। অবোধ্য, অভিনব, অত্যাশ্চর্য অনেক কিছুকেই ভাবতে পারি সমান্তরাল মহাবিশ্বের। কতদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এমন মানুষদের, যাদের ভেবেছি এই পৃথিবীর নয়!

ইসাবেল বলে কোনো নির্দিষ্ট সমান্তরালের কথা। 'ক' আর 'ম' মহাবিশ্বের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে, সে বলে। তোমাদের 'ম' মহাবিশ্ব যেমন প্রসারিত হচ্ছে, 'ক' তেমনভাবেই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

আমাদের মহাবিশ্বও তো একদিন সঙ্কুচিত হবে, মন্তব্য করি আমি। সেটা এখনও স্পষ্ট নয়, উত্তর দেয় ইসাবেল। আমার হিসেব মতে তোমাদের মহাবিশ্বের প্রসারণ হচ্ছে না, বরং ত্বরান্বিত হচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে তত গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের কাছ থেকে আরো দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা ছিল। ইসাবেল আমাকে যা বলল সেটা যদি সত্য হয় তবে তাহলে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার (এবং এই ঘটনার সাত বছর পরে পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রমাণ পান যে মহাবিশ্বের স্ফীতি ক্রমশ ত্বরান্বিত হচ্ছে)।

এখন আমি বুঝি শত সূর্যের স্বপ্নের অর্থ। কবি রবার্ট ফ্রস্ট পৃথিবীর জন্য হিমশীতল পরিণতির চেয়ে বেছে নিয়েছিলেন এক অগ্নিতপ্ত মৃত্যু। ভাবি, পৃথিবীর আকাশে শত সূর্য ভাসবে, না প্রকৃতির শেষ খেলায় একটা মাত্র সূর্য পৃথিবীকে শুষে নেবে? সভ্যতা কি ততদিন বাঁচবে? পৃথিবীর মানুষ কি যেতে পারবে আকাশ পার হয়ে আর একটা পৃথিবীতে? একটা মহাবিশ্ব কি অন্য একটার সঙ্গে যুক্ত? স্বগতোক্তি করি আমি, ইসাবেল সেটা শুনতে পায়।

আপাতদৃষ্টিতে যুক্ত নয়, তবে কোয়ান্টাম লেভেলে যুক্ত, উত্তর দেয় ইসাবেল। প্রতিটি মহাবিশ্বকে তুমি মনে করতে পার একটি বহুতল বাড়ির এক একটি তলা; কিন্তু তলাগুলো বিযুক্ত, একটি তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়ার উপায় নেই– কোনো সিঁড়ি নেই, কোনো লিফট নেই। একেক তলার মানুষ অন্য তলা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, তারা দুটি মাত্রায় বিচরণ করে, তৃতীয় যে একটা মাত্রা থাকতে পারে সেটা তাদের মাথাতেই আসে না। হঠাৎ যদি সেই বাড়িতে একটা সিঁড়ি আবির্ভূত হয় তবে সেই সিঁড়ি দিয়ে অন্য তলা বা বিশ্বে ভ্রমণ করা যেতে পারে। ইসাবেলের কথায় আমার মনে পড়ে এশারের আঁকা একটি ছবির কথা 'উত্তরণ ও অবতরণ', যেখানে পাদ্রি সাধুরা সারিবদ্ধ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচু একটি তলা থেকে উঁচু একটি তলায় উঠেছে, আবার উঁচুতলা থেকে যখন তারা ওপরে উঠছে তারা ফিরে আসছে আগের নিচুতলায়। ক্রমাগত উত্তরণের মাঝে রয়েছে অবতরণ, দৃষ্টিবিভ্রম। একটা অসম প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে এশার একটা অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করেছেন।

চারপাশের সাদা তুষারের মধ্যে গাড়ির রেডিওতে পরিচিত কিছু গান মনকে উদাস করে দেয়। ইসাবেল বলে, পৃথিবীতে জীবন যেন ছোট ছোট গান, তার একটা কথা আছে, সুর আছে, তার পেছনে আছে অনেক লোকের বাজনা। কিছু গান চিরকালের মতো থেকে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ গানই ইতিহাসে হারিয়ে গেছে।

ইসাবেলের কথায় একটা বিষাদের সুর থাকে। বলি, তোমার কথায় দুঃখ লেগে আছে, তোমার বিশ্বে কি আমাদের মতো দুঃখবোধ আছে? আমার মনে পড়ে ইসাবেলের গলা ছিল ভারাক্রান্ত, সে বলল, নেই!? তোমার কি মনে হয়? ভাবলাম, ইসাবেল পীয়েরের কথা ভাবছে। ইসাবেল আমার মৌনতা লক্ষ করল, বলল, আমি পীয়েরের কথা ভাবছি না। পীয়েরের গান আমাদের বিশ্বে অনেক দিন থাকবে। আমি ভাবছিলাম, আমার গান কি থাকবে এই পৃথিবীতে?

পীয়ের আসার অনেক আগেই আমাদের সভ্যতা অন্য মাত্রা ব্যবহার করে আমাদের মহাবিশ্বের মধ্যে যাতায়াত করতে পারত, ইসাবেল আবার তার কাহিনী শুরু করে। তিনটি স্থানের মাত্রা ও একটি কালের মাত্রা নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব, কিন্তু আমরা জানতাম অন্য মাত্রাগুলো সঙ্কুচিত হয়ে এই মহাবিশ্বের মধ্যেই আছে, তবে সেগুলোকে উন্মুক্ত করতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। তোমাকে আগেই বলেছি আমরা হচ্ছি টাইপ-৩ সভ্যতা—পুরো গ্যালাক্সির একটা বড় অংশের শক্তি আহরণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ ছাড়া যখন একটা বিশালাকার তারার বিস্ফোরণ হয়, তোমরা যাকে সুপারনোভা বল, সেই তারার পুরো বিস্ফারিত শক্তিটাই আমরা ধরে রাখতে পারি। সেই শক্তিগুলো স্থান-কালের তলে চালিত করলে ঐ তলে অবস্থিত অন্য মাত্রাগুলো মুহূর্তের জন্য উন্মোচিত হয়।

আমি কি ততক্ষণে ইসাবেলের কথা বিশ্বাস করেছিলাম? অনেক সময় পার হয়ে গেছে ঐ দুর্যোগের রাত্রির পর, এই কাহিনী যখন লিখতে বসেছি— আমি জানি সেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কিছু এসে যেত না। ছোটবেলা থেকে আমার রাতের আকাশের প্রিয় নক্ষত্র ছিল শুভ্রনীল অভিজিৎ—ভাবতাম নীল নক্ষত্রের সভ্যতা কেমন হবে? সেই তুষার ঝড়ের রাতে ইসাবেল ছিল নীল নক্ষত্রের কন্যা, সকালের ইসাবেলের কালো চুল, চশমা ও ওভারকোটের দৃঢ়তা রাতের অন্ধকারে হয়ে উঠেছিল ভঙ্গুর আর সেই মোহময় ভঙ্গুরতা আমাকে নিয়ে চলেছিল হাইওয়ে ৯৫-এর পিছল পথ ধরে দক্ষিণে।

এর মধ্যেই আমাদের বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণ গহ্বরের মাধ্যমে অন্য একটি মহাবিশ্বে যাওয়ার উপায় বের করলেন, ইসাবেল বলে। তুমি যদি একটি নির্দিষ্ট পথে একটি ঘুরন্ত ব্ল্যাক হোলে ঢুকতে পার তবে তার সিংগুলারিটি, বা যে অবস্থায় স্থান-কালের বক্রতা অসীম থাকে, সেই অবস্থাকে এড়াতে পার। কিন্তু যেসব মহাবিশ্বে আমরা ভ্রমণ করতে পারতাম সেগুলোর কোনোটাই আমাদের মতো মানুষের বসবাসের উপযোগী ছিল না। আর তখনই পীয়েরের আবির্ভাব। হাজার বছরের স্থবিরতার পর পীয়েরের আবিষ্কার আমাদের জন্য ছিল নতুন দিগন্তের দিশারি। পীয়েরের হাইপোথেসিস ছিল সরল। পীয়েরের আমাদের বলল,

অসীমসংখ্যক বিশ্বের মধ্যে ঠিক আমাদের মতো সঠিক বিশ্বকে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে যেকোনো ব্ল্যাক হোলের মাধ্যমে ভ্রমণ করলে পাওয়া যাবে না, শুধু অনুমানের ভিত্তিতে খুঁজলে অসীম সময় লাগবে 'ক'-এর মতো আর একটি মহাবিশ্বকে খুঁজে পেতে। পীয়ের বলল, আমাদের এমন একটা উপায় বের করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা অসীমসংখ্যক বিশ্বকে সীমিত সময়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আর তারপর পীয়ের তৈরি করল এই বাক্স। গর্বের সঙ্গে ইসাবেল উচ্চারণ করে 'এই বাক্স'। ভাবি, অপেক্ষা করেছিল এক মহাবিশ্ব কোনো ত্রাতার জন্য, পীয়েরের গান সেই মহাবিশ্বে অবশ্যই অমর হবে।

এই বাক্স, ইসাবেল বলে, তোমাদের বিশ্বে একে বলবে রোবট; কিন্তু এটা ঠিক রোবট নয়, এটা হচ্ছে এক আন্তর্মহাজাগতিক যান। পীয়েরের কথা অনুযায়ী আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করতে পারি, তবে তার জন্য আমাদের এমন এক যন্ত্র তৈরি করতে যা কিনা অতীতে যেতে পারে। অন্য মাত্রা ব্যবহার করে যে অতীতে ভ্রমণ সম্ভব সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানতাম; কিন্তু সেই ভ্রমণের ফলে যে কোয়ান্টাম কম্পন সৃষ্টি হওয়ার কথা সেটা আমাদের মহাবিশ্বের চরিত্র বদলে দিতে পারত, ঐ মহাবিশ্বে হয়ত আমাদের সভ্যতা সৃষ্টিই হত না।

অতীত নিয়ে পরীক্ষা করলে যে ভবিষ্যৎ বদলে যেতে পারে সেটা নিয়ে অনেক বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে, নীল বাক্সটা গাড়ির পেছনে না থাকলে আমি বলতাম, 'ক' মহাবিশ্বের কাহিনী এক ট্র্যাজিক বিজ্ঞান কল্পনা। তবু ইসাবেলের কোয়ান্টাম কম্পন আমাকে আধো মেঘলা আকাশের নিচে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ছায়াঘেরা এক শ্যামল ধূসর উপত্যকায় নিয়ে যায়, যেখানে আমি 'ক' মহাবিশ্বের বাঁচার অভিযানের শরিক হতে চাই।

ইসাবেল বলে চলে, আমি আগেই বলেছি পীয়েরের আইডিয়াটা ছিল অজটিল কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। পীয়েরের প্রকল্প ছিল যে, আমাদের যন্ত্র হবে স্বয়ংক্রিয় ও নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম। সেই যন্ত্র যাকে আমি বলব 'খ', সেই 'খ' যন্ত্র আমাদের মহাবিশ্বেরই একটি অদৃশ্য মাত্রাকে ব্যবহার করে ফিরে যাবে অতীতে, ঐ অতীতে সৃষ্টি করবে নিজের কোটি কোটি প্রতিলিপি 'গ'-যন্ত্র। তারপর প্রতিটি প্রতিলিপি 'গ'-যন্ত্র কোটি কোটি ব্ল্যাক হোলের মাধ্যমে ভ্রমণ করবে পৃথক পৃথক মহাবিশ্বে। তার মধ্যে কোনো একটি মহাবিশ্ব যদি 'ক'-এর মতো হয় তবে প্রতিলিপি 'গ'-যন্ত্র ফিরে আসবে 'খ'-যন্ত্রের কাছে, আর 'খ'-যন্ত্র সেই তথ্য নিয়ে ফিরে আসবে আমাদের 'ক' মহাবিশ্বে। কিন্তু 'ক'-এর মতো মহাবিশ্বের সন্ধান এত সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই প্রতিটি 'গ'-যন্ত্র যেটা কিনা আর একটি মহাবিশ্বে ভ্রমণ করেছে সেটা সৃষ্ট করবে কোটি কোটি 'ঘ'-যন্ত্র, যেগুলো ভ্রমণ করবে অন্য

আরো মহাবিশ্বে যা কিনা সৃষ্টি করবে 'ঙ'-যন্ত্র, 'ঙ'-যন্ত্র সৃষ্টি করবে 'চ'-যন্ত্রের। এমনি করেই একটা ধারা চলতে থাকবে প্রায় অসীম পর্যন্ত। এই ধারাকে আমি বলব ১ নম্বর ধারা। নতুন যন্ত্রের সৃষ্টি ও অন্য মহাবিশ্বে ভ্রমণের জন্য বলতে গেলে কোনো সময়েরই দরকার হয় না, হয়ত সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

বাইরের তুষার ঝড় আমাকে ইসাবেলের বর্ণনা পুরোপুরি বুঝতে দেয় না, শুধু দেখি এক রাশ বাক্স— নীল, হলুদ, সবুজ, লাল, সাদা—যারা এক মহাশূন্যতায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাবি বর্ণমালার সব অক্ষর ব্যবহার করে একটা অসীম সিরিজ তৈরি করা সম্ভব, আবার শুধু একটি অক্ষর দিয়ে সেই অসীমতা সম্ভব যেমন নননননন...। স্বগোতক্তি করি, ভন নয়মান মেশিন।

ইসাবেল শুনতে পায়। বলে, হ্যাঁ, তোমাদের এক বিজ্ঞানী এরকম আত্মপ্রতিলিপি বানাতে সক্ষম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন। জন ভন নয়মান। কিন্তু পীয়েরের প্রস্তাবনা ছিল আরো গভীর। এরপর শোনো, ইতিমধ্যে আমাদের আদি, অতীতে পাঠানো, 'খ'-যন্ত্র ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে থাকবে এবং 'খ'-যন্ত্র সময়ের সেই মুহূর্তগুলোয় আরো 'গ'-যন্ত্র সৃষ্টি করবে, যারা অন্য মহাবিশ্বে ভ্রমণ করবে, এই ধারাও ১ নম্বর ধারার মতো বলতে গেলে অসংখ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করবে, এটা হবে ২ নম্বর ধারা। আর একটু ভবিষ্যতে হবে ৩ নম্বর ধারা। এমনি করে চলতে থাকবে যতদিন না 'খ'-যন্ত্র আমাদের সময়ে এসে পৌঁছায়। যদি কোনো ধারা 'ক'-এর মতো মহাবিশ্বের সন্ধান পায় তবে সেই ধারা তার ফেলে আসা পথ ধরে 'খ'-যন্ত্রকে জানাবে সেই তথ্য। তবুও 'খ'-যন্ত্র নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি করতে থাকে—দ্বিতীয় আর একটি প্রতিলিপি পাওয়ার একটি সম্ভাবনা সব সময়ই আছে। এভাবে আমাদের যন্ত্ররা অসীমসংখ্যক মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে সীমিত সময়ে। সমস্ত তথ্য নিয়ে প্রায় অসংখ্য 'খ' যন্ত্র উপস্থিত হবে আমাদের সময়ে। বলতে গেলে যে মুহূর্তে আমরা একটি 'খ'-যন্ত্রকে অতীতে পাঠাব সেই মুহূর্তেই প্রায় অসংখ্য 'খ'-যন্ত্র আমাদের কাছে, এই বর্তমানে, উপস্থিত হবে। তার কাছে থাকবে বহু 'ম' মহাবিশ্বের তথ্য।

যে মুহূর্তে আমরা 'খ'-যন্ত্রকে অতীতে পাঠাব সেই মুহূর্তেই 'খ'-যন্ত্র আমাদের কাছে, এই বর্তমানে উপস্থিত হবে, তার কাছে থাকবে বহু 'ম' মহাবিশ্বের তথ্য, ইসাবেলের কথাটার পুনরাবৃত্তি করি আমি। কৌশলগতভাবে নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা চমকপ্রদ, তবু ভাবি ব্ল্যাক হোলের মাধ্যমে কি সত্যিই তথ্য পাঠানো সম্ভব? বলি, কিন্তু মহাবিশ্বের অসীমতার মাঝে যন্ত্রগুলো কোনো ব্ল্যাক হোলই বা খুঁজে পাবে কেমন করে?

এটা তোমাদের বিজ্ঞানীরাও জানেন, ইসাবেল উত্তর দেয়। তুমি জানো যে অতি বিশাল একটি নক্ষত্র তার জ্বালানি ফুরিয়ে ফেললে বিস্ফোরিত হতে পারে, বিস্ফোরণের পরে নক্ষত্রের যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু ছোট হয়ে সৃষ্টি করে ব্ল্যাক হোলের। তবে এই ধরনের ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বে অসংখ্য হলেও তাদের খুঁজে পেতে সময় লাগবে। তবে মহাবিশ্বে আরও বড় ব্ল্যাক হোল আছে, প্রায় প্রতিটি গ্রালাক্সির কেন্দ্রে খুব বড় একটা ব্ল্যাক হোল অবস্থিত। তারা এত বড় যে তাদের ভর একশো কোটি সূর্যের সমান হতে পারে। প্রতিটি যন্ত্র নিকটবর্তী গ্যালাক্সির কেন্দ্রে চলে যায়, সেখানে একটা ব্ল্যাক হোল থাকতে বাধ্য।

আর এই পৃথিবীকে? এই 'ম' মহাবিশ্ব না হয় খুঁজে পেলে, কিন্তু এই বিশাল মহাবিশ্বে এই ছোট পৃথিবীকে তোমরা পেলে কেমন করে? এটা তো সমুদ্রের মধ্যে একটা ধূলিকণা। আমি বলি।

ইসাবেল হাসে, বলে, এটা বলতে পার আমাদের ভাগ্য। আমরা জানতাম আমাদের পৃথিবীর মতো 'ম' মহাবিশ্বের পৃথিবী হয়ত স্বাভাবিক গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত, কারণ কেন্দ্রে বিকিরণের মাত্রা বেশী হতে পারে। সেজন্য আমরা ছায়াপথের মত স্পাইরাল বা সর্পিল গ্যালাক্সির বাইরের অংশটাই জরীপ করি। আর সূর্যের মতো মোটামুটি দীর্ঘজীবি তারাদের খুঁজি, যার গ্রহগুলো বুদ্ধিমান জীবন বিকাশের সময় পাবে। তবে এটাও ঠিক যে, আমরা আসলে তোমাদের মত সভ্যতা খুঁজছিলাম না, মোটামুটি বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজছিলাম যেখানে আমরা নতুন করে বাসা বাঁধতে পারব। একটু চুপ থেকে ইসাবেল বলে, তুমি এটা জানো কিনা জানি না, তোমরা যেটা দৃশ্যমান মহাবিশ্ব বল সেটা 'ম' মহাবিশ্বের একটা সামান্য অংশ মাত্র। আমাদের জন্যেও এটা সত্য, আমরা টাইপ-৩ সভ্যতা হতে পারি, আমরা অগণিত মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করতে পারি, তবুও আমাদের 'ক' মহাবিশ্বের পুরোটা আমরা জানতে পারিনি, সেটা আমাদের পক্ষে জানা কখনই সম্ভব হবে না।

ভাবি, আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতো আরো গ্যালাক্সি হয়ত আছে 'ম' মহাবিশ্বে যেখানে উন্নত জীবন থাকতে পারে, কিন্তু তারা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বাইরে, তাদের সঙ্গে বলতে গেলে কোনোদিনই তোমাদের দেখা হবে না।

ইসাবেল বলতে থাকে, আমাদের একটি স্বয়ংক্রিয় যান তোমাদের মহাবিশ্বে আবির্ভূত হয়, সেটা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার ছিল না। সেই বাক্স বুঝতে পারে তোমাদের মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক মাত্রাগুলো আমাদের মহাবিশ্বের মতোই, ঐ তথ্য নিয়ে ফিরে যায় সেই যন্ত্র 'খ'-যন্ত্রের কাছে, পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে যন্ত্র ছিল অজ্ঞ। আর 'খ'-যন্ত্র 'ম' মহাবিশ্বের

ঠিকানা নিয়ে পৌঁছায় আমাদের বর্তমানে। আমরা তখনও জানতাম না পৃথিবী গ্রহ রয়েছে 'ম' মহাবিশ্বে। 'ক' থেকে 'ম' মহাবিশ্বে এরপর বেশ কয়েকটা যান পাঠানো হয় যেগুলো অবশেষে পৃথিবীকে আবিষ্কার করে। আর এখন পৃথিবীকে ঘাঁটি করে আমরা তোমাদের মহাবিশ্বটাকে বুঝতে চাইছি।

ইসাবেলের কাহিনী আমি অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না, কিন্তু আশা বা আশংকা ছিল যে এই অভিযানের অন্য অর্থ আছে। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আর পীয়ের কি 'ক'-এর প্রথম প্রতিনিধি? ইসাবেল উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমরাই প্রথম। কিন্তু 'ক' থেকে 'ম' মহাবিশ্বে ঝাঁপ দেয়াটা পীয়েরের জন্য কষ্টকর হয়েছে, এটা তার মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পৃথিবীতে এসে পীয়েরের 'ক' -এর কথা একেবারেই মনে নেই। আজ কত বছর হয়ে গেল আমাদের এখানে আসা, এখন শুধু আমাদের ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

আমার মনে পড়ে সেই তুষারঢাকা কুইবেকে আমরা গাড়িতে, পীয়ের মনে করতে চেষ্টা করছিল তার অতীতকে, মনে পড়ে পীয়ের চিনতে পারছিল না ইসাবেলকে। কল্পনা করি কুইবেকের শীতে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ইসাবেল পীয়েরের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বাইরে তুষার পড়ছে। বছরের পর বছর কেটে যায়, ইসাবেল স্বপ্ন দেখে তার দেশে ফিরে যাওয়ার। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখে সাদা তুষার কেমন করে ঢেকে দেয় সামনের বাড়ির ছাদ, নিচের ফুটপাত। শীতের গাছে পাতা নেই, ধীরে ধীরে গাছ ঢেকে যায় নরম তুষারে।

জর্জিয়া ছাড়িয়ে তখন আমরা ফ্লোরিডায় পড়েছি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। ইসাবেলের কথামতো আমরা চলেছি মায়ামিরও দক্ষিণে, ফ্লোরিডা দক্ষিণপ্রান্তে অনেকগুলো দ্বীপ সারি দিয়ে সমুদ্রের মাঝে পরপর দাঁড়িয়ে, তাদেরকে বলা হয় ফ্লোরিডার কি'জ— ফ্লোরিডার চাবি। ফ্লোরিডা কি'জের দ্বীপগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি ব্রিজ দিয়ে, ইউ.এস. ১ নম্বর রাস্তা সেগুলোর ওপর দিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (হাওয়াইকে বাদ দিলে) সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। কিন্তু তখনও আমরা ৯৫ নম্বর ইন্টারস্টেট রাস্তার ওপর। আমরা পরপর কয়েকটা গাড়ি আর ট্রাক দুর্ঘটনার জায়গা পার হই, সেখানে পুলিশ, দমকল আর হাসপাতালের গাড়ি জটলা করছিল। দু-একটা জায়গায় রাস্তার ওপর রাখা স্ট্রেচারে কাপড় ঢাকা দেহ চোখে পড়ে।

তোমাদের জায়গায় মৃত্যু নেই? জিজ্ঞেস করি ইসাবেলকে। আছে, বলে ইসাবেল। মৃত্যুকে আমরা পুরোপুরি এড়াতে পারিনি। সম্ভাব্যতার সূত্র ধরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটার একটা সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। তাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা খুব উন্নতি করলেও দুর্ঘটনাকে

একেবারে নির্বাসন দিতে পারিনি। এই নিয়ে হাজার বছর বাঁচতে পারি, কিন্তু তাতে জীবনের সমতা রাখা সম্ভব নয়। জীবনের সমতা কি জান? তোমাদের পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলোতে মানুষ গড়ে সত্তর, আশি, নব্বই বছর বাঁচে। এই ধরনের জীবনকাল মোটামুটিভাবে জীবনের সমতা রক্ষা করে, কারণ দুর্ঘটনায় যে মারা যায় তার বয়স শূন্য থেকে ওই নব্বই, আশি হবে। দুর্ঘটনায় তোমার প্রিয়জন, বন্ধু, শিশু খুব অল্প বয়সে মারা যেতে পারে, কিন্তু তারপর তুমি যদি এক হাজার বছর বাঁচো তাতে জীবনের সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এইটুকু বলে ইসাবেল চুপ করে যায়। আমি পীয়েরের মৃত্যুর কথা ভাবি। এমন হতে পারে ইসাবেলের কোনো কথাই সত্যি নয়। এমন হতে পারে পীয়ের আর ইসাবেল গবেষণায় নিযুক্ত ছিল, কোনো দুর্ঘটনায় তারা দুজনেই মাথায় আঘাত পেয়েছে। পীয়ের যে ভারসাম্যহীন সেটা তো দেখেছিই, ইসাবেলও আঘাত পেয়ে যুক্তি হারিয়েছে, ভিন মহাবিশ্বের কল্পনা করছে। কিন্তু ইসাবেল আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক— তার কথায় ও যুক্তিতে কোনো জড়তা নেই। কিন্তু মহাজাগতিক ভ্রমণের কথা এত বিশ্বাস নিয়ে কে বলবে?

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমরা তখন মায়ামি ছাড়াচ্ছি। পাঁচ-ছয় বছর আগে আমি এই পথ গিয়েছি, মায়ামি ছাড়িয়ে ফ্লোরিডা কি'জের একেবারে শেষ প্রান্তে কি-ওয়েস্ট শহরে। ফ্লোরিডা কি'জের দ্বীপগুলোর দু-পাশের সমুদ্র স্বচ্ছ সুনীল উষ্ণ। সেখানকার গাছ আর বাতাস বিষুবীয়, নতুন আশায় পূর্ণ, আমার স্মৃতিতে সেই ফ্লোরিডা কি'জ সূর্যের সোনালি আলোয় ছিল উদ্ভাসিত। কিন্তু ঐ রাতের ফ্লোরিডা কি'জ ছিল অন্ধকার, বৃষ্টির ধারায় পথ দেখা যাচ্ছিল না। ঘুমের চোখে, একদিন পুরো টানা গাড়ি চালানোর পরে গাড়িটাকে কোনোভাবে রাস্তার মধ্যে ধরে রাখছিলাম।

কি লার্গো। ফ্লোরিডা কি'জের প্রথম বড় বসতি, কফি খেতে আমরা থামি। ক্যাফেতে ইসাবেল টেবিলের অন্যদিকে বসে বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকে। ইসাবেলকে কোনো ঘরের ভেতর যতবার দেখেছি সে বাইরের দিকে চেয়ে থেকেছে, বাইরের বিশাল শূন্যতা সব সময়ই তার মন অধিকার করে আছে। আমি বললাম, ইসাবেল, আমরা কেন কি-ওয়েস্ট যাচ্ছি?

ইসাবেল তার আয়ত চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি ভুলে গেছ আ.। তোমাকে বলেছিলাম যে আমি চলে যাচ্ছি। আমি জানি যে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না; কিন্তু আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। তুমি

সবকিছু ভেবেচিন্তে বুঝবার আগেই আমি চলে যাব। কিন্তু আ., তুমি আমার জন্য অনেক করেছ, তোমাকে আর একটা কাজ আমার জন্য করতে হবে।

বাইরে প্রচণ্ড বাতাসে কাফের জানালা কাঁপে। ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের ওপর রাখা টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছিল ভার্জিনিয়া আর ম্যারিল্যান্ডে তুষার ঝড়ের তাণ্ডব। যে মেয়েটি আমাদের কফি দিচ্ছিল সে কাউন্টারের পেছন থেকে আমাদের দিকে তাকায়, সে হয়ত ভাবে এমন ঝড়ে এই দুজন রাস্তায় কি করছে? ইসাবেল কাজের কথাটা আর বলতে পারে না। বাতাসে কাফের জানালার একটা কাচ ভেঙে পড়ে। বৃষ্টির ঝাপ্টা আসে ভেতরে। আমরা উঠে পড়ি। ইসাবেল পেছনের সিটের ওপর থেকে নীল বাক্সটা তুলে নিয়ে তার পায়ের নিচে রাখে।

ফ্লোরিডা কি'জের দ্বীপগুলো বেশ ক'টি দীর্ঘ সেতু দিয়ে যুক্ত একটি সেতু প্রায় সাত মাইল লম্বা। দুপাশে অশান্ত সমুদ্র, মাঝখানে মাঝেমধ্যে সরু দ্বীপ বা কখনো লম্বা সেতুর ওপর দিয়ে আমি গাড়ি চালাই। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্রপাতের তীক্ষ্ণ শব্দ জানান দেয় বিদ্যুতের নিকটবর্তিতা। তাদের আলোয় দেখি দিগন্ত পর্যন্ত এক কালো সমুদ্র আর সামনে এক নির্জন রাস্তা। এর মধ্যে ম্যারাথন নামে একটা বসতি পার হয়ে আসি, সামনেই কি-ওয়েস্ট, এই পথের শেষ।

এত দিন ধরে যেসব স্বপ্ন দেখছি সেগুলো সম্বন্ধে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল, তার পরিবর্তে ইসাবেলকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি তোমার জায়গায় এ রকমই দেখতে? এই প্রশ্ন করি যেন এর উত্তর আমাকে দিয়ে দেবে সব রহস্যের সমাধান। ইসাবেল আমার হাতে তার হাত রাখে। আমি প্রায় এ রকমই দেখতে আ., সে বলে, হয়ত একটু অন্যরকম। তুমি আমাকে যেরকম ভাববে আমি সেরকমই। কিন্তু আর সময় নেই, আ.। আকাশ আজ ভেঙে পড়ছে, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, তোমার ম্যারিল্যান্ডের বাসার রান্নাঘরের কাউন্টারে আমি একটা জিনিস রেখে এসেছি। সেটা একটা মানচিত্র, তার সাথে আছে কিছু নির্দেশনা। এই কাজটা অনেক বড়, কিন্তু সেটা করে দিলে একটা পুরো সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী থাকবে।

গাড়ি তখন একটা সেতুর ওপর উঠছিল। জিজ্ঞেস করতে চাই, কী ধরনের কাজ? কিন্তু কথাটা আমার বলা হয় না। একটা বিশাল বাজ পড়ল মনে হয় যেন গাড়ির ওপরেই, গোটা সেতু আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর মধ্যে মনে হয় যেন একটা আলোর রেখা আকাশটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল। আমার অন্ধত্বের স্থায়িত্ব ছিল হয়ত মাত্র এক সেকেন্ড; কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল গাড়ির পথ এলোমেলো করে দিতে, গাড়ি গিয়ে ধাক্কা খেল পাশের রেলিংয়ে, রেলিং গাড়ির ভার ধরে রাখতে পারল না, রেলিং ভেঙে

গাড়ি পড়ে যেতে লাগল নিচের জলে।

গাড়ি পড়তে লাগল। 'পড়তে লাগল' লিখছি, আসলে দু-তিন সেকেন্ডের বেশি ঐ 'পড়ার' স্থায়িত্ব ছিল না। গভীর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল রাতের আকাশ, কালো রাত মিশেছিল কালো সমুদ্রে। আমার মনে হয়, যদিও এতে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, জলের সঙ্গে প্রথম ধাক্কাটা লাগল গাড়িটার কোনায়, কাজেই ভরবেগের পরিবর্তন হলো ধীরে, যেটা আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছিল। গাড়ি ডুবে যেতে থাকল, আমি জানালার কাচ নামাতে শুরু করলাম, জল প্রবল বেগে ঢুকতে লাগল ভেতরে। সিটবেল্ট খুলে ডান দিকে তাকালাম, অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, হাত বাড়িয়ে ইসাবেলকে ধরতে গেলাম, আমার হাত কিছুই স্পর্শ করল না। জলে গাড়ি পুরো ভরে গেল, আমার শরীর ভেসে উঠে গাড়ির ছাদে দিয়ে ঠেকল, আমি আর দম রাখতে পারছিলাম না। চেষ্টা করলাম ইসাবেলকে ছুঁতে, আবারও তাকে ধরতে পারলাম না। আমার মনে পড়ে সেই মুহূর্তের আতঙ্ক, ভয়ার্ত ইসাবেল হয়ত আমার হাতের কয়েক সেন্টিমিটারের মধ্যেই মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে তার সিটবেল্ট খুলতে কিন্তু আমি তাকে সাহায্য করতে পারছি না। এর মধ্যেই গাড়িটা তলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। আমি আর থাকতে পারলাম না, জানালা দিয়ে দেহটা কোনোমতে বের করে ওপরে উঠে এলাম। জলের গভীরতা বেশি ছিল না সেখানে, হয়ত চার মিটার। বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ল কপালে, চোখে-মুখে। ডাঙ্গা বেশিদূর ছিল না, ভাবলাম তীরে পৌঁছে ইসাবেলকে দেখতে পাব। সাঁতড়ে তীরে পৌঁছলাম, কিন্তু ইসাবেল সেখানে ছিল না।

ইসাবেলের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রবল বর্ষণে, উত্তাল সমুদ্রের পাড়ে, শেষ মহাপ্রলয়ের সাক্ষী হিসেবে যেন আমি ইসাবেলের অপেক্ষায় রইলাম। অসহায় ইসাবেলকে গাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না। চিৎকার করতে থাকলাম, ইসাবেল, ইসাবেল; কিন্তু চিৎকার বৃষ্টির শব্দ, বজ্রের গর্জন ছাপিয়ে ওপরে উঠতে পারল না, সেই চিৎকার এক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার আকাশের নিচে হারিয়ে গেল। এত সহজে কি একটা মানুষকে হারিয়ে ফেলা সম্ভব? ইসাবেলের শেষ কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম, সে বলছিল আর সময় নেই, সে কি জানত এই পরিণতির কথা? প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বড় রাস্তা ধরে কি-ওয়েস্টর দিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না।

দিন ৮. কি-ওয়েস্ট, ফ্লোরিডা

কাল রাতে আমি যখন কি-ওয়েস্টের পুলিশ স্টেশনে এসে পৌঁছালাম ততক্ষণে প্রায় দু' ঘণ্টা সময় কেটে গেছে দুর্ঘটনার পর, রাত একটা বাজে। পুলিশকে বললাম, আমার গাড়ি জলে পড়ে গেছে, গাড়ির মধ্যে একজন আছে, সে বের হতে পারে নি। পুলিশ প্রথমে ফোন করল কোস্টগার্ডের ডুবুরিদের, তারপর তাদের গাড়িতে আমাকে নিয়ে এল ঘটনাস্থলে। তখনও বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু কোনো বজ্র-বিদ্যুৎ ছিল না। তারা খুব শক্তিশালী সার্চলাইট জলের ওপর ফেলে দেখতে চাইল গাড়িটাকে, কিছুই দেখা গেল না। ইতোমধ্যে কোস্টগার্ডের দুজন ডুবুরি এল, এই অন্ধকারেও তারা জলে ডুব দিল। গাড়ি তীর থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, মিনিট পনেরো পর তারা ফিরে এল। গাড়িতে কেউ নেই, ডানদিকের আরোহীর দিকের দরজা ভেতর থেকে লক করা, কাচের জানালা ওঠানো, কোনোভাবেই সেই দিক দিয়ে কারো বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চালকের দিকের দরজাও বন্ধ, তবে সেটার জানালা খোলা, সেই খোলা জানালা দিয়েই আমি বের হয়ে এসেছিলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম আরোহীর সিটের ওপর কোনো বাক্স তারা দেখেছে কিনা। না, কোনো বাক্স তারা দেখে নি।

পুলিশ স্টেশনে ফিরে এলে তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। এই ঘটনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মোরেনো একটা কাগজ নিয়ে এসে আমার জবানবন্দি নেয়া আরম্ভ করল। আমার সঙ্গীর নাম কী ছিল? ইসাবেল। সে জিজ্ঞেস করল, ইসাবেল কী? ইসাবেলের পদবি কী? বললাম, তার পদবি আমি জানি না। মোরেনো প্রশ্ন করল, কীভাবে আপনি তাকে চেনেন? বললাম, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ম্যারিল্যান্ডে, ইসাবেল আমার কাছে ফ্লোরিডা পর্যন্ত একটা রাইড চেয়েছিল। সে বলল, কত দিন হল তার সঙ্গে আপনার পরিচয়? উত্তর দিলাম, দুদিন। দুদিন? ক্যাপ্টেন বিস্মিত হল, দুদিনের পরিচয়ে আপনি তাকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত রাইড দিতে রাজি হলেন? বললাম, এই রকম সিদ্ধান্ত তো আমরা অনেক সময়ই নিয়ে থাকি, বিশেষত যদি সে ইসাবেলের মতো কেউ হয়। মোরেনো হাসল, তারপর বলল, আপনি কি নিশ্চিত যে গাড়িতে দুর্ঘটনার সময় আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল? আমি সাথে সাথেই উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসাবেল আমার সাথে ছিল। তার আগে আমি ২০ ঘণ্টা ইসাবেলের সাথে পথে ছিলাম, আমি নিশ্চিত দুর্ঘটনার ঠিক আগে সে গাড়িতে ছিল। মোরেনো বলল, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু গাড়িতে অন্য কোনো আরোহীর চিহ্ন আমরা পাইনি। নিমজ্জিত গাড়ি থেকে পালানোর আর কোনো উপায় ছিল না, সে ক্ষেত্রে ইসাবেলের অদৃশ্য হওয়াকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? চুপ করে রইলাম। মোরেনো বলল, আপনাকে আমি একটা মোটেলে নামিয়ে দিচ্ছি। আজ রাতে বিশ্রাম করুন, আর সকালে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ফোন করে গাড়ি উদ্ধারের ব্যাপারে আলোচনা করুন।

রাতে মোটেলে থাকলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু সে রাতের ঘুম ছিল সমুদ্র-ভাবনায় ভরা। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের নিচে স্রোতে ভেসে চলেছে ইসাবেলের অচেতন দেহ, জলের গভীরে সাঁতার কেটে আমি ধরতে চাইছি তাকে, তার পা ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার আঙুল। আমার দেহ ঘেঁষে চলে যায় অতিকায় কচ্ছপ, স্টিংরে মাছ, দূরে ঘোরে হিংস্র হাঙর। তারপর ভেসে যায় নীল বাক্স আর ইসাবেল চলে যায় দৃষ্টিসীমার বাইরে। ইসাবেল ফিরে গেছে 'ক' মহাবিশ্বে, ঘুমের মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলি। সকালে ঘুম ভাঙলে প্রথমে ভাবি ম্যারিল্যান্ডে শুয়ে আছি, তারপর রাতের প্রলয় মনে পড়ে।

গাড়িতে ইসাবেল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই পৃথিবীটা কীভাবে তৈরি? হয়ত সেটা প্রশ্ন ছিল না, হয়ত সেটা ছিল স্বগতোক্তি, অথবা বা শেষ পর্যন্ত, অনেক কিছুর মিল সত্ত্বেও, তার আর আমার পৃথিবীর মধ্যে তফাৎ ছিল অনেক। কীভাবে তৈরি? আমি বলব প্রকৃতি দিয়ে, জীব দিয়ে। কিন্তু ইসাবেলের প্রশ্ন সেটা ছিল না। আমার সন্দেহ হয় ইসাবেলের প্রশ্ন ছিল আদি মানুষের মতো চিরন্তন, ইসাবেলের প্রশ্ন ছিল মানুষের জীবনের সঙ্কট নিয়ে। আজ এতদিন পরে যখন কাহিনী লিখছি তখন বাতাসে আন্দোলিত জলে অধরা প্রতিবিম্বের কম্পনের মতোই স্মৃতির রেশ আমার কাছে ইসাবেলের প্রশ্নকে অবোধ্য করে রাখে। হয়ত ইসাবেল প্রশ্ন করেছিল মানুষের বোধের ব্যাপারে। ভেবেছিলাম তার প্রশ্ন ছিল আরো সাধারণ—পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন নিয়ে। মনে পড়ে উত্তর দিয়েছিলাম, পৃথিবীর মূল দুটি উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন ও সিলিকন, আর পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে লোহার এক বিশাল গোলক।

এই উত্তর শুনে ইসাবেল হেসেছিল। হাসির প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করেছিলাম, আর তোমাদের? তোমাদের পৃথিবী ঝড়ের না যুদ্ধের? ইসাবেলের হাসি থেমে গিয়েছিল। সে বলেছিল, এর উত্তর দেয়া কঠিন, আ.। আমরা মনে করেছিলাম যুদ্ধকে আমরা চিরতরে বিদায় করে দিয়েছি, কিন্তু যুদ্ধ আমাদের শেষ পর্যন্ত ছাড়েনি। তোমাকে সেই পৃথিবীর কথা বলা সম্ভব নয় আমার, আ., কারণ এক অর্থে সেটা তোমারই ভবিষ্যৎ।

পরদিন কি-ওয়েস্টের সকালে সূর্য ঝলকাচ্ছিল ওপরে। একটা ধীর বাতাস বইছিল উত্তর থেকে, গতকালের
উত্তাল সাগর ছিল শান্ত। রাতের প্রলয়ের চিহ্ন ছিল না, আমি ভাবি এটা কেমন করে সম্ভব, আমি ভাবি জীবন কি সত্যিই সমতা রাখে? আজকের এই সুন্দর সকালে কি ইসাবেলের এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা নয়? ছোট ছোট রাস্তা, বাড়ি, ছোট ছোট সুন্দর বিপণি, দোতলা ব্যালকনি, দু-একটা পামগাছ, সমুদ্রের হালকা গন্ধ, সি-গাল পাখির ডাক। এ

উজ্জ্বল নীল আকাশের নিচে উত্তরের শীতের তুষার তখন অনেক অনেক দূরে। আমি হেঁটে গেলাম আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কি-ওয়েস্টের বাড়িতে। এখানে বসে লিখেছেন *A Farewell to Arms* আর *The Snows of Kilimanjaro*. এখানে বসে লিখতে শুরু করেছিলেন *For Whom the Bell Tolls*. হেমিংওয়ে আমার হিরো, কিন্তু আজ আমার সময় নেই সেই বাড়িতে ঢুকবার। কথাটা ঠিক বললাম না, আসলে আমার মন নেই আজকে হেমিংওয়েকে দেখবার। ইসাবেল কি হেমিংওয়ে পড়েছে?

১ নম্বর রাস্তার শেষে ছিল একটা ফলক 'রুট ১ শেষ', তারপর সমুদ্র সমুদ্রের পাড়ে ছিল একটা ছোট মনুমেন্ট—তার গায়ে লেখা 'কিউবা ৯০ মাইল'।

পুলিশ স্টেশনে যেখন পৌঁছলাম হোসে মোরেনো ততক্ষণে এসে গেছে। কাল রাতে তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল সে আমাকে অবিশ্বাস করে নি। আমার একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, ইসাবেল সবাইকে অবাক করে হাজির হবে। কিন্তু মোরেনো বলল, ১ নম্বর রাস্তার কোথাও ইসাবেলকে দেখা যায় নি। আর ইসাবেলের নামে কোনো নিখোঁজ সংবাদও সে পায় নি। সে বলল, কেমন আশ্চর্য আবহাওয়া দেখেছ আমাদের, কাল এই দুর্যোগ, আর আজ চমৎকার ক্যারিবিয়ান আবহাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম, ফ্লোরিডা কি'জে এ রকম ঝড় নাকি প্রায়ই হয়? মোরেনো বলল, হয় তবে হারিকেনের মাসগুলোতে, শীতে নয়। আমার বাবা কিউবা থেকে এখানে অনেক আগে চলে আসেন, কিউবা তো মাত্র নব্বই মাইল, সাঁতার দিয়েই প্রায় চলে যাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালে বাবা দেখেছিলেন কি'জে এক ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস, তাতে কয়েক হাজার লোক মারা গিয়েছিল। আমি আর মোরেনোকে বাংলাদেশের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কথা বললাম না। শুধু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়েই মারা গিয়েছিল কয়েক লাখ মানুষ।

দিন ১০. ম্যারিল্যান্ড

সমুদ্র থেকে গাড়ি আর তোলা হলো না, সেটা করতে যে টাকা লাগত তার বদলে পুরোনো একটা গাড়ি কেনা সম্ভব, পুলিশ হয়ত গাড়িটা তুলত যদি তারা ইসাবেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতো। এত বছর পরে ঐ গাড়ি নিশ্চয়ই হয়েছে সামুদ্রিক জীবদের এক খেলাঘর। মায়ামি থেকে প্লেন আমাকে নিয়ে আসে ম্যারিল্যান্ডে, ডানদিকের জানালার ধারে বসে আমি দেখতে চাই দূরে আটলান্টিক মহাসাগর। আটলান্টিক দেখা যায় না, নিচে চরাচর ঢেকে থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন মেঘের বিস্তারে যাকে কিনা মনে হয় এক সমতল হিমবাহ। সেই হিমবাহের মধ্যে থাকে ফাটল, তার ক্র্যাভাসে মিলিত হয়েছে মেঘের মোজাইক।

নিচের পৃথিবী সাদা ক্যানভাসে ঢেকে থাকে যেমন ঢেকে থাকে ইসাবেলের জীবন আর পীয়েরের মৃত্যু। দুটি মানুষেই চলে গেছে, 'ক' বলে কিছু থেকে থাকলে তার সঙ্গে কি এই আমার শেষ যোগাযোগ?

যতীন যখন আমাকে বাল্টিমোর এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নেয় তখন সূর্য ডুবছে। আমার কাহিনী শুনে যতীন প্রথমে মন্তব্য করে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসর জেফ্রি হিল, আমাদের ল্যাবের অধিকর্তা, আমার খোঁজ করেছেন কিনা। যতীন বলল, জেফ্রিকে আমি বলেছি তুমি জীবনমৃত্যুর সংগ্রামে ব্যস্ত। বলে হাসল। আমি বললাম, জান যতীন, গত সাত দিন আমার মনে হয়েছে আমি একটা অন্ধকূপে আটকা পড়েছি, সেখান থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। ইসাবেলের মৃত্যু বা তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আমাকে সেই কূপ থেকে বের করে আনে নি, বরং এমন একটা হতাশার মধ্যে নিয়ে গেছে যেখানে আমার এই দৈনন্দিন কাজের কোনো মূল্য দেখি না। এ রকম হওয়ার কথা ছিল না, যতীন, আমি তোমাকে বলতে পারব না ইসাবেলের কথা আমি বিশ্বাস করেছি না অবিশ্বাস করেছি। এটা কী ধরনের প্যারাডক্স?

যতীন আমার কথার উত্তর দেয় না, বলে, কাল পারলে কাজে এসো, তোমাকে দু-একটা জিনিস দেখানোর আছে। তবে তাতে সবকিছুর সমাধান হবে না, কিন্তু সেগুলো কিছু বিষয় পরিষ্কার করতে পারে। যতীন আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

আমার রান্নাঘরের কাউন্টারে ছিল একটা চিঠি। ইসাবেলের। চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখেছিল একটা লম্বা নলের মতো জিনিস—দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনো বড় কলম।

প্রিয় আ.,

এই চিঠি যখন পড়বে তখন আমি হয়ত চলে গেছি। এই চিঠি যখন লিখছি তোমার সঙ্গে আমার একবার মাত্র কথা হয়েছে, একটু পরেই তোমার সঙ্গে আমার স্মিথশনিয়ান মিউজিয়ামে দেখা করার কথা। কিন্তু এই চিঠি যখন তুমি পড়বে ততক্ষণে তুমি আমাকে ভালোভাবে চিনবে, এই চিঠি যখন পড়বে তোমার সম্বন্ধেও আমি হয়ত অনেক কিছু জানব। আমি জানি আগামী দিনে আমি যেসব কথা বলব সেগুলোকে বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে তুমি আমার জন্য অনেক করবে, তবু আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে। আমি যদি বলি একটা পুরো সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী থাকবে তুমি সেটা বিশ্বাস করবে না, তাই বলব এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

এই চিঠি যখন পড়বে তখন তুমি 'খ'-যন্ত্র সম্পর্কে সবকিছু শুনেছে। একটা 'খ'-যন্ত্র তুমি কুইবেক থেকে বয়ে এনে ফ্লোরিডা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য হবে আ.— এই পৃথিবীতে আর একটা 'খ'-যন্ত্র আছে। স্কাইলস নামে এক আততায়ী আমাকে অনুসরণ করছে, তার হাত থেকে ঐ 'খ'-যন্ত্রটা বাঁচাতে হবে। সে জানে না সেটা কোথায় লুকানো আছে।

আ., তুমি মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্কাইলস ছাড়া আর একজন এই দ্বিতীয় 'খ'-যন্ত্র সম্পর্কে জানে, এই যন্ত্রটা তার দরকার 'ক' মহাবিশ্বে ফিরে যাওয়ার জন্য। সে যদি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তবে তাকে সাথের মানচিত্রটা দিয়ে দিও। কেমন করে বুঝবে সে সঠিক ব্যক্তি? বুঝবে। আর সে যদি যোগাযোগ না করতে পারে তবে তোমার ওপর আমি এর একটা দায়িত্ব দিয়ে যাব।

টেবিলের ওপর যে মানচিত্রটা আছে সেটা ইউটার একটি অঞ্চলের, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের উত্তরে। 'খ'-যন্ত্রটা আছে সেইখানে। এই চিঠির সাথে দেখবে একটা লেজার রাখা আছে, সেটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। এ লেজারটা তিনটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কাজ করে— অবহেলিত, দৃশ্যমান ও অতিবেগুনি, তিনটি তরঙ্গের জন্য তিনটি বোতাম আছে। 'খ'-যন্ত্রটা যখন খুঁজে পাবে, দেখবে তার পৃষ্ঠে একটা অস্বচ্ছ জানালা আছে (তুমি তো সেটা অন্য বাক্সটাতেও দেখেছ)। সেই জানালায় তাক করে তিনবার অতিবেগুনি, দুবার দৃশ্যমান ও একবার অবহেলিত তরঙ্গের বোতামটা টিপবে। তাহলেই হবে। স্কাইলসের হাত থেকে আমাদের সবার বাঁচবার এটা একমাত্র উপায়।

বিদায়, আ.। ফ্লোরিডার পরে আমাদের আর দেখা হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব তোমাকে একটা চিঠি পাঠাতে, আকাশের দিকে লক্ষ রেখ।

— ইসাবেল

চিঠিটা পড়ে আমি জানালার বাইরে তাকাই, অন্ধকার। ইসাবেল জানত আমি তাকে ফ্লোরিডা নিয়ে যাব, তার কালো চোখ নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে জানত, সে বুঝেছিল আমি তার অনুরোধ অস্বীকার করব না। তাই চিঠিটা দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই লিখেছিল, তারপর আমার অলক্ষে রেখে গিয়েছিল যখন আমরা বাসা থেকে বের হই ল্যাব থেকে নীল বাক্সটা উদ্ধার করতে। ইসাবেল আরো জানত, সে ফ্লোরিডা থেকে ফিরে আসবে না। তাহলে সে ক্যারিবিয়ানের স্রোতে ভেসে যায়নি, অন্ধকারের মধ্যেও আমি আলো দেখি। টেবিলের ওপর থেকে বড় কলমের মতো লেজারটা হাতে তুলে নিই, 'খ'-যন্ত্রের মতো সেও

কী বহন করছে এক ভিন্ন মহাজগতের প্রকৌশল? লেজারের রঙবিহীন মসৃণ তলে হাত বুলাই, 'খ'-যন্ত্রের মতো সেও কি বুঝছে আমার উপস্থিতি? তার তলে লাল, নীল ও বেগুনি তিনটি বোতাম দেখে ভাবলাম অবলোহিত, দৃশ্যমান ও অতিবেগুনি। টেবিলের ওপর ছিল একটা মানচিত্র—ইউটা স্টেটের দক্ষিণ অঞ্চলের এস্কালান্তে নদীর দুর্গম গিরিখাতের। চড়াই-উতরাইয়ের অবোধ্য সমোন্নতি রেখায় ইসাবেল একটা কাটা চিহ্ন দিয়ে 'খ'-যন্ত্রের জায়গাটা দেখিয়েছে।

সে রাতে আমি কোনো স্বপ্ন দেখিনি, ইসাবেলের 'খ' -যন্ত্র সব স্বপ্ন নিয়ে চলে গেছে দূরে। হিমবাহের অপ্রতিরোধ্য শুভ্র নীল স্রোতে অথবা মরুর নরম উষ্ণতায় সে হয়ত দেখাতে চেয়েছিল আমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎ, ইসাবেলের ভবিষ্যৎ, আর বিষুবীয় বনে কেবিনের রেডিওতে যে আকুল বার্তা এসেছিল তা হয়ত 'ক' মহাবিশ্বের আর্ত আবেদন। সে রাতে আবার আমি শুনি ছোট বনের পেছনে মালবাহী ট্রেনের নস্টালজিক ধ্বনি, আমি ভাবি সেই ট্রেন চলেছে উত্তরে, উত্তর মেরুতে—সব লোকালয় ছাড়িয়ে, তুষারবৃত তুন্দ্রার ফার আর স্প্রুস গাছের বনকে পেছনে ফেলে। আমার মনে পড়ে পীয়ের বলেছিল এই অভিযানের শুরু বা শেষ বলে কিছু নেই।

দিন ১১. ম্যারিল্যান্ড

সকাল সাড়ে সাতটায় একটা ফোন আসে, হ্যালো, আমি অফিসার ফ্রেড কম্পটন। আমি ছিলাম পীয়ের লাবন্তিয়ের দুর্ঘটনার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আপনি কি আমাদের অফিসে আজ দুপুর দুটোয় আসতে পারবেন?
ফ্রেড কম্পাটনকে আমি পীয়েরের দুর্ঘটনার পরে ফোন করেছিলাম। হ্যাঁ আসতে পারি, বলি আমি, আপনার কাছে কি নতুন কোনো তথ্য এসেছে? কম্পটন বলে, না সে রকম কিছু নয়, তবে পীয়ের লাবন্তিয়ে সম্পর্কে দু-একটা কথা আপনার কাছে আমাদের জানবার ছিল।

আমি যে গতরাতে ম্যারিল্যান্ড ফিরেছি কম্পটন সেটা নিশ্চয়ই জেনেছে, কি-ওয়েস্ট পুলিশ কি তাকে ফোন করেছে? কি-ওয়েস্টে অফিসার মোরেনোকে আমি পীয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিনি আর পীয়েরের দুর্ঘটনার ম্যারিল্যান্ডের পুলিশ-রিপোর্টে আমার নাম নেই। তাহলে অফিসার কম্পটন আজকেই আমাকে ফোন করল কেন? কম্পটনের ফোন আমাকে ভাবিত করে, কী জানতে চায় সে আমার কাছ থেকে?

কাজে আসা মাত্র যতীন ফটোকপি করা দুটো বিজ্ঞান প্রবন্ধ নিয়ে আসে। কাল রাতে তোমার কাহিনী শুনে আমার কিছু বিষয় মনে পড়ে, যতীন বলে। কয়েক বছর আগে, তখনও আমি ছাত্র, আমার এক প্রফেসর আমাদের ভবিষ্যৎ বা অতীত সময়ে ভ্রমণ সম্ভব কিনা তা নিয়ে একটা ক্লাস প্রজেক্ট করতে বলে, সেই সময়ে আমি কিপ থর্ন আর রিচার্ড গটের লেখা পড়ি, সে বলে।

ফিজিক্যাল রিভিউ পেশাদার পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে উঁচুমানের পত্রিকা। সেই পত্রিকায় ক্যালটেকের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কিপ থর্ন লিখেছেন, সাধারণ স্থান-কালের কন্টিনিয়ামে বিশাল শক্তি ব্যবহার করে একটা ওয়ার্ম হোলের সৃষ্টি সম্ভব, যার মাধ্যমে মহাবিশ্বের সুদূর প্রান্তে মুহূর্তে চলে যাওয়া যেতে পারে। থর্নের মতে, এই ধরনের ওয়ার্ম হোল দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা যাবে। তবে ওয়ার্ম হোলকে খুলে রাখার জন্য দরকার এক ধরনের অদ্ভুত কণিকার যাকে থর্ন বর্ণনা করেননি, তবে তাঁর মতে অনেক দূর ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা হয়ত এই ধরনের কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে।

দ্বিতীয় লেখাটা ছিল প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ রিচার্ড গটের। তিনি ভবিষ্যতের উন্নত সভ্যতায় বিশাল মহাজাগতিক স্ট্রিংকে (ইংরেজিতে বললে কসমিক স্ট্রিং) ব্যবহার করে সময়ে ভ্রমণ করা সম্ভব সেটা দেখিয়েছেন। মহাজাগতিক স্ট্রিং বলে কিছু আছে কিনা এই মুহূর্তে আমরা জানি না। থাকলে, পদার্থবিদরা বলছেন, তার বিস্তার হতো বিশাল—কয়েক আলোকবর্ষের সমান, তাকে আয়ত্ত করা হয়ত শুধু টাইপ-৩ সভ্যতার পক্ষেই সম্ভব।

যতীনের দিকে তাকালাম। যতীন বলল, তোমার কী মনে হয়, ইসাবেল এই প্রবন্ধগুলো পড়ে সেগুলোকে বিশ্বাস করে তার চারদিকে নিজের জগৎ পড়েছে? আমি চুপ করে রইলাম। ইসাবেলের কাহিনীর সরাসরি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইসাবেলকে যতীন দেখেনি, ইসাবেলের কথা সে শোনেনি, যতীনের পক্ষে ইসাবেল আর ইসাবেলের জগৎ মূর্ত নয়। শুধু বললাম, আর তোমার? তোমার কী মনে হয়, যতীন, ইসাবেল বেঁচে আছে? যতীন মাথা নাড়ে। আমি জানি না, আ., বলে সে, তবে আমি বলব শুধু 'ক' মহাবিশ্বই ইসাবেলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। 'ক' না থাকলে ইসাবেলও নেই। আর নীল বাক্স? নীল বাক্সকে তো আমরা বুঝতে পারিনি, বলি আমি। না, বুঝতে পারিনি, সায় দেয় যতীন।

দুটোর সময় পুলিশ স্টেশনে গেলাম। ফ্রেড কম্পটনকে যেমন ভেবেছিলাম সে একেবারেই সে রকম নয়। ষাটের কাছাকাছি হবে তার বয়স। মনে হলো আমাকে ডেকে সে লজ্জিত (পরে বুঝলাম তার কারণ)। জিজ্ঞেস করলাম পীয়ের সম্বন্ধে সে কিছু জেনেছে কিনা।

কম্পটন কানাডাতে ফোন করেছিল, তারা বলেছে পীয়েরের মানসিক ভারসাম্য ছিল না। তারপর কম্পটন জানাল আমাকে আসলেই কেন ডাকা হয়েছে। এফবিআই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

এফবিআই? ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন কোনো গুরুতর ব্যাপার না হলে পীয়েরের দুর্ঘটনায় আগ্রহী হতো না। যদি কোনো অপরাধ শুধু একটা স্টেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে তবে এফবিআই সেটা পুলিশের হাত থেকে নিয়ে নেয়। শঙ্কিত হলাম, তারা কি পীয়ের আর ইসাবেলের যোগাযোগটা ধরে ফেলেছে? কম্পটনকে জিজ্ঞেস করি, কেন? কম্পটন সেটা জানে না। সে আমাকে দোতলায় নিয়ে একটা বড় ঘরে বসিয়ে চলে যায়। আমি অপেক্ষায় থাকি, আমার সামনে একটা বড় টেবিল, পাশে বড় জানালা, জানালা পেরিয়ে বড় রাস্তা, ট্রাফিক লাইট, গাড়ির জটলার ক্ষীণ শব্দ জানালার কাছে মৃদু কম্পন তোলে। শীতের পাতা ঝরা গাছ আমাকে কেন জানি পীয়েরের কথা মনে করিয়ে দেয়, পীয়েরের সঙ্গ আমার পছন্দ হয়েছিল, পীয়েরের মধ্যে ছিল এমন একটি উন্মুক্ত সহৃদয়তা, আমি বলব আকর্ষণীয় সহৃদয়তা। আর ইসাবেল? সেসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পীয়েরকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তবু আমার কাছে কোনো ধাঁধার সমাধান নেই, আর এফবিআইর যোগসূত্রটা ধরতে পারি না।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ঘরে ঢোকে যে লোক তাকে আমার মনে হয় খুব চেনা। সেকেন্ড দুই লাগল আমার সামলে নিতে, তারপর টুপির নিচে ছাঁটা বাদামি চুল, তীক্ষ্ণ থুতনি মনে করিয়ে দিল স্পেস মিউজিয়ামের উদভ্রান্ত পলায়ন। স্কাইলস। আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, আমাকে পালাতে হবে। কিন্তু স্কাইলসের পেছন পেছন ঢোকে একজন নারী, বাইরে যাওয়ার রাস্তা যেন বন্ধ হয়ে যায় আমার। স্কাইলসকে কে আশা করেছিল এই পুলিশ স্টেশনে? হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করলাম, ফ্রেড কম্পটন কোথায় গেল?

আমি জানি না স্কাইলস আমার অসহায় অবস্থাটা উপভোগ করছিল কিনা, কিন্তু সে দেরি না করেই বলল, মিস্টার আ., আমি এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট জেরার্ড স্কাইলস, আর ইনি হচ্ছেন আমার সহকর্মী, স্কাইলস ডান হাত দিয়ে নির্দেশ করে তার পেছনের মানুষটিকে, ইনি হচ্ছেন রিটা ম্যাকিন্টায়ার। রিটা ম্যাকিন্টায়ারের চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ও উদাসীনতা। তার ছিল উন্নত চিবুক, পরনে পেশাদারি স্কার্ট ও লম্বা ওভারকোট, ওভারকোটের ওপর ছড়িয়ে ছিল সোনালি চুল। রিটা ম্যাকিন্টয়ার আমাকে সম্বোধন করার চেষ্টা করে না। তার সোনালি চুল আমাকে বিভ্রান্ত করে দেয় । 'ক' মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

স্কাইলস একটা চেয়ার নিয়ে আমার খুব কাছাকাছি বসে, রিটা ম্যাকিন্টায়ার বসে না, সে

বড় জানালাটার ধারে গিয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকায়।

মিস্টার আ., স্কাইলসের কণ্ঠস্বর যেন অন্য মহাবিশ্ব থেকে ভেসে আসে, মিস্টার আ., ইসাবেল কোথায়? আমি যেন সব বোধ হারিয়ে ফেলি, সম্বিত ফিরলে ভাবি স্কাইলস কেন ইসাবেলকে শুধু ইসাবেল বলে সম্বোধন করছে, ইসাবেলের পদবি কি সে জানে না? ইসাবেল কি এমন একটা মানুষ যার পদবি থাকতে পার না। আমার অসহায়তাকে সংযত করে বললাম, ইসাবেলকে আমি শেষ দেখি চার দিন আগে, যখন এক দুর্ঘটনায় আমার গাড়ি জলে পড়ে যায়। আমি সাঁতরে ডাঙায় উঠি, ইসাবেল উঠতে পারে নি। এই বলে ভাবি স্কাইলসকে বেশি তথ্য দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সে সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করে, আপনার কি ধারণা ইসাবেলের দেহ সমুদ্রে ভেসে গেছে? স্কাইলসের গলার স্বর নিরুত্তাপ, কিন্তু তার দুই চোখে এক বিস্ফারিত উত্তেজনা।

কি উত্তর দেব বুঝে পাই না। কিন্তু স্কাইলস আমাকে আবার সময় দেয় না। মিস্টার আ., আমাদের কাছে খবর আছে যে ডুবুরিরা গাড়ির মধ্যে তার দেহ খুঁজে পায়নি। বলতে যাচ্ছিলাম, গাড়ির সব কটি দরজা বন্ধ ছিল, আর শুধু আমার দিকের অর্থাৎ চালকের দিকের জানালাটা খোলা ছিল। অচেতন অবস্থায় কোনো প্রকারেই ইসাবেলের দেহ গাড়ি থেকে বের হতে পারত না; কিন্তু আমি তা বললাম না। বললাম, আমি জানি, আমি সেখানে ছিলাম।

মিস্টার আ., স্কাইলস কোটের পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই বের করে কি যেন লিখতে শুরু করে, আপনার ইমিগ্রেশন পরিস্থিতি কি? স্কাইলস আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে আসলে কী চাইছে? আমি কাজ করি, বলি, আমার 'এইচ-ওয়ান' ভিসা আছে।

আপনি ইসাবেলকে কতদিন হল চিনতেন? স্কাইলস দ্রুত ফিরে যায় ইসাবেলের কথায়। এক সপ্তাহ আগে তাকে আমি চিনতাম না, বলি আমি (কি-ওয়েস্টের অফিসার হোসে মোরেনো একই প্রশ্ন আমাকে করেছিল)। স্কাইলস কোনো মন্তব্য না করে বলল, আপনার সঙ্গে ইসাবেলের পরিচয় হয় কোথায়? কানাডায়?

না, কানাডায় নয়। ইসাবেলের সঙ্গে আমার পরিচয় তার বন্ধু পীয়েরের মাধ্যমে ম্যারিল্যান্ডেই।

পীয়ের লাবন্তিয়ে? প্রশ্ন করে স্কাইলস। আমি সায় দিই। পীয়েরের সঙ্গে আপনার কীভাবে পরিচয়? স্কাইলস প্রশ্ন করে দ্রুত। দিন দশেক আগে পীয়েরকে আমি কুইবেক থেকে

ফেরার পথে রাইড দিই। কথাটা বলে মনে হয় যেন সেই রাইডের পর বহু বছর কেটে গেছে।

ইসাবেলকে নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? স্কাইলস আবার প্রশ্ন করে। স্কাইলসের কথা আমাকে ভাবতে দেয়া না তার পরিচয় সম্বন্ধে। মহাজাগতিক আততায়ী না এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট? কি-ওয়েস্ট, ফ্লোরিডা, উত্তর দিই আমি। কেন? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি, তারপর বলি, ইসাবেল হেমিংওয়ের বাড়ি দেখতে চেয়েছিল। হেমিংওয়ে? স্কাইলসের গলার বিস্ময়ে মনে হলো সে যেন হেমিংওয়ের নাম শোনেনি।

রিটা ম্যাকিন্টায়ার জানালা দিয়ে দূরে কোথায় যেন কি দেখছিল, হেমিংওয়ের নাম শুনে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকায়, তার সোনালি চুল আমাকে কী যেন মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু আমি তা ঠিক ধরতে পারি না। তার জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি আমাকে ইসাবেলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কি-ওয়েস্টে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে থাকতেন। ইসাবেল হেমিংওয়ের খুব ভক্ত ছিল, আমি বলি। ইসাবেল কি আদৌ হেমিংওয়ের নাম শুনেছে? আমি ভাবি। স্কাইলস শুধু বলতে পারল, ওহ! সে যেন বিশ্বাস করতে পারল না আমার উত্তরটা। এই প্রথমবার স্কাইলস তার প্রশ্নে বিরতি দেয়, কয়েক মুহূর্ত সে কী বলবে বুঝে পায় না। তারপর সে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে টেবিলের পেছনে দাঁড়ায়, বলে, মি. আ. আপনি কী বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছেন সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আপনাকে একটা বিদেশী রাষ্ট্রের হয়ে গোয়েন্দা কাজ করবার জন্য অভিযুক্ত করতে পারে।

আমি অন্য অনেক কিছু ভাবছিলাম, এই দিকটার কথা কখনও ভাবিনি। এটা কি সম্ভব, ভাবি আমি, কী সূত্রে আমি গোয়েন্দা কাজে নিযুক্ত? স্কাইলস ভয় দেখানোর জন্য নতুন পদ্ধতি নিয়েছে। ম্যাকিন্টায়ার স্কাইলসের দিকে তাকায়, স্কাইলসের যেন এখনই এই অভিযোগটা করার ছিল না।

মি. আ., স্কাইলস বলে, আপনি জানেন কিনা জানি না, ইসাবেল ও পীয়ের দুজনেই কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে কাজ করতেন। আমি মাথা নাড়লাম না বলে, কিন্তু স্কাইলস সেটা অগ্রাহ্য করল। স্কাইলস বলল, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ন্যাটোর সদস্য। ন্যাটো চুক্তির অধীনে পেন্টাগন কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা কাজ দেয়, ইসাবেল ও পীয়ের ছিল সেই কাজের প্রধান দুই কর্মকর্তা। আশ্চর্য হয়ে স্কাইলসের দিকে তাকাই, ইসাবেলের মধ্যে যে শিক্ষা জগতের প্রাতিষ্ঠানিক ছাপ ছিল সেটা আমি

বুঝেছিলাম। আমার মুখের আশ্চর্য ভাব স্কাইলসের চোখ এড়ায় না।

স্কাইলস ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। গোপনীয়তা রক্ষার্থে? ম্যাকিন্টায়ার জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে তখনও, এই জিজ্ঞাসাবাদে কি তার ভূমিকা নেই? স্কাইলস এসে আমার সামনে টেবিলের ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, বলে, পেন্টাগন যখন ইসাবেল আর পীয়েরকে কাজটা দেয় তখন শীতল যুদ্ধ চলছে, সোভিয়েতরা আফগানিস্তানে, কমিউনিস্টরা মধ্য আমেরিকায়। তাদের দুজনের একটা যন্ত্র বানানোর কথা ছিল। 'খ'-যন্ত্র, ভাবি আমি।

স্কাইলস বলে, সেটা কী যন্ত্র ছিল তা আমি বলতে পারব না, সেই তথ্য নিয়ন্ত্রিত। ইসাবেলরা ঐ যন্ত্র বানাতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছিল কিনা সেটাও আমি বলতে পারব না, আমাদের গোয়েন্দা তথ্য বলে সেই যন্ত্র তৈরি করার সময় তাদের মতের পরিবর্তন হয়। হয়ত সোভিয়েতরা তাদের যথেষ্ট পয়সা দিয়েছিল, অথবা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছিল। যাই হোক তারা সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের গবেষণার ফলাফল তারা কিউবা নিয়ে যাবে। কিউবা থেকে হয়ত রাশিয়া। আপনি কি ইসাবেলের সাথে একটা বাক্সমতন যন্ত্র দেখেছেন?

কোনো ধরণের ঐচ্ছিক কারণ ছাড়াই আমার মুখ দিয়ে বের হল, না। আমি যেন প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলাম নীল বাক্সর অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য। স্কাইলসের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হল, কপালের চামড়া কুঁচকে গেল, চোখের মণি শ্বাপদের মত ঝলকাল, মুখ বিস্তৃত হল। সে আমাকে বিশ্বাস তো করেই নি, বরং আমার আস্পর্ধা বা সাহস তাকে ক্রুদ্ধ করেছে।

কি-ওয়েস্ট থেকে কিউবা নব্বই মাইল, আমার মনে পড়ে ১ নম্বর রাস্তার শেষে ছিল ঐ সাইনবোর্ড। এক ঝড়ের রাত্রিতে অপেক্ষা করছিল কি কিউবার জাহাজ ক্যারিবীয় সাগরে? ইসাবেল আর নীল বাক্স ভেসে গিয়েছিল কি সেই জলযানের কাছে? পরাশক্তির দ্বন্দ্বে আমি কি অনিচ্ছুক অংশগ্রহণকারী? স্কাইলস নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মি. আ. আপনি ইসাবেলকে কিউবা যেতে সাহায্য করেছেন। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। আপনি কি জানেন এর জন্য আপনার কি শাস্তি হতে পারে?

'ক' মহাবিশ্ব মনে হল অনেক দূরে। আমি শুধু বললাম, আমি এসবের কিছুই জানি না। স্কাইলস উঠে গিয়ে ম্যাকিন্টায়ারের সাথে খুব আস্তে কথা বলল, শুনতে পেলাম না। দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে কোনো মতৈক্যে পৌঁছল। স্কাইলস ফিরে এসে বলল, মি. আ., আমাদের তথ্য বলে ইসাবেল ও পীয়ের দুটো যন্ত্রের

ওপর কাজ করছিল। আমরা জানি ইসাবেল একটা যন্ত্র ফ্লোরিডা নিয়ে যায়। আপনি কি জানেন আর একটা যন্ত্র কোথায় আছে?

এতক্ষণে স্কাইলসের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ইসাবেল আমাকে মানচিত্রে এঁকে দিয়ে গেছে বাক্সের অবস্থান, কিন্তু লিখেছে স্কাইলসের হাতে বাক্স যেন না পড়ে, ইসাবেল লিখেছিল স্কাইলসের হাত থেকে আমাদের সবার বাঁচবার এটাই একমাত্র উপায়। আমি ভাবি এখন নব্বইয়ের দশক— ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষে হয়ে এল বলতে, বার্লিন দেয়াল পড়ে গেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নও আর নেই, ফিদেল কাস্ত্রো যদিও-বা আছে ইসাবেল কি তার কাছে নীল বাক্স নিয়ে যাবে? আজ অফিসার কম্পটন আমাকে বলেছে, পীয়ের একটা বাস্তুহারা আশ্রয়স্থলে ছিল। অথচ স্কাইলস বলছে, পীয়ের শেষাবধি গবেষণা করে যাচ্ছিল। পীয়েরকে যেমন দেখেছি, তাতে তাকে বাস্তুহারাই মনে হয়েছে, এ ছাড়া ইসাবেলও বলেছে সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। স্কাইলসকে বললাম, একটা যন্ত্র? না, ইসাবেল আমাকে সে বিষয়ে কিছু বলেনি।

স্কাইলাস বলে, মি. আ., আপনার কি কখনো মনে হয়েছে পৃথিবীকে বাঁচানোর ভার আপনাকে বহন করতে হবে, সেজন্য যে-কোনো স্বার্থত্যাগ করতে আপনি প্রস্তুত? স্কাইলস বলতে থাকে, যখন ছোট ছিলাম আমি ভাবতাম বড় হয়ে আমি পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান করে দেব, ভাবতাম বড়রা কি বোকা, সহজ সব জিনিসের সমাধান করতে পারে না। কিন্তু কোনো কিছুই সহজ নয়, মি. আ., এতদিনে সেটা আপনি বুঝেছেন। যে জিনিসটা আপনি সহজ ভেবেছিলেন তার পেছনে অনেক জটিলতা আছে। এই লড়াইয়ে আপনি ভুল দিক বেছেছেন, আ.। আপনার এখন সঠিক কাজটা করা দরকার। আপনাকে বলে রাখি, আমাদের কাছে কোনো তথ্য গোপন করলে আপনাকে আমরা গ্রেফতার করতে বাধ্য হব।

বুঝতে পারলাম না স্কাইলসের কথাগুলো নেহাতই আমাকে ভয় দেখানোর জন্য কিনা। আমার মনে হলো তার কাছে আমার সম্বন্ধে সে রকম কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই, এই মুহূর্তে সে আমার ক্ষতি করতে পারবে না। যদিও আমার স্কাইলস সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল, আমি এই প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষ টানতে চাইছিলাম। বললাম, আপনার আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি এখন যেতে চাই, আমার কিছু কাজ আছে।

স্কাইলস বোধহয় আমার দিক থেকে এমনি বেয়াড়াপনা আশা করে নি। সে ম্যাকিন্টায়ারের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা চাই আপনি যদি যন্ত্রটা সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানতে পারেন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যন্ত্রটার মধ্যে একটা আত্মরক্ষামূলক বিস্ফোরক আছে, গোপন সঙ্কেত ছাড়া কেউ যদি যন্ত্রটা খুলতে চায় তবে সেটা বিস্ফোরিত হতে পারে। স্কাইলস তার বিজনেস কার্ড আমার দিকে বাড়িয়ে

দেয়।

বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সন্ধ্যা হয়ে আসে, শীতের আকাশ মেঘে ঢাকা। পীয়ের চলে গেছে, ইসাবেল চলে গেছে, রেখে গেছে স্কাইলসকে, আর স্কাইলস নিয়ে এসেছে রিটা ম্যাকিন্টায়ারকে।

পীয়েরের অভিযান এখানেই শেষ হওয়ার নয়। স্কাইলসকে মহাজাগতিক আততায়ী হিসেবে আমি কখনোই ভাবিনি, তবে এফবিআই এজেন্ট হিসেবেও তাকে ভাবা যায় না। রিটা ম্যাকিন্টায়ারকে কি এফবিআই এজেন্ট হিসেবে ভাবা যায়? স্কাইলস অযৌক্তিক কিছু বলেনি, কিন্তু ইসাবেলের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। একটা অলীক মহাবিশ্বের প্রতি আমার আনুগত্যে আশ্চর্য হলাম না, আমি জানি পরোক্ষভাবে সেটা ছিল ইসাবেলের স্মৃতির প্রতি আমার বিশ্বস্ততা।

বাসায় ফিরে ইসাবেলের চিঠিটা আবার পড়ি। সাথের মানচিত্রটা দেখি, ইউটার দক্ষিণে এস্কালান্তে নদীর এক দুর্গম গিরিখাতে 'খ'-যন্ত্রটা রয়েছে, রাস্তা থেকে হেঁটে পৌঁছাতে সেখানে দুদিন লাগবে। ইসাবেল লিখেছে লেজার রশ্মি দিয়ে 'খ'-যন্ত্রের ওপরে আলো ফেলতে। কেন? তাকে ধ্বংস করে দিতে? হয়ত তার আগেই ইসাবেলের প্রতিনিধি বাক্সটা নিতে আসবে। আর স্কাইলস আমাকে ভয় দেখাল বাক্সটার মধ্যে বোমা আছে বলে। বোমা বোধহয় নেই, তবুও ভুল হাতে পড়বার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নীল বাক্সের কোনো প্রতিরক্ষা আছে।

এই সময়ে আমার মনে পড়ল ইউটার স্লট ক্যানিয়নে ভ্রমণের জন্য আমার গাড়িতে একটা প্রচারপত্র রাখা ছিল। কে সেই কাগজ রেখেছিল তা ধরতে পারিনি, তবে আমি দোকানে গিয়েছিলাম ইউটা আর আরিজোনার ওপর বই দেখতে। বইয়ের দোকানে ইসাবেল ছিল। ইসাবেলের চিঠিটা হাতে করে জানালার কাছে যাই, ইসাবেল কি অন্য মহাবিশ্ব থেকে আমাকে দেখছে? ইসাবেল, তুমি ছকটা ভালোই সাজিয়েছিলে!

দিন ৪৫. ইউটা

এর পরের কয়েকদিন গেল ইসাবেলের সেই যোগাযোগের অপেক্ষায়। পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদের পর স্কাইলস একবার আমার ল্যাবে ফোন করেছিল। জানতাম সে এত সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে না, সে নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করার ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে।

ম্যারিল্যান্ড থেকে ইতিমধ্যে শীত চলে যেতে শুরু করেছে, আমি ইসাবেলের প্রতিনিধির আশা ছেড়ে দিলাম। ফেব্রুয়ারি শেষ হল, মার্চের অর্ধেক চলে গেল, আমি ইউটা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যতীন আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ঐ সময় আমাদের ল্যাবে একটা চুরির ঘটনা ঘটল, কেবল একটা জিনিসই চুরি হলো, আমরা নীল বাক্সের ওপর থেকে যে নমুনা নিয়েছিলাম একটা কৌটায় সেটা রাখা ছিল। চুরি হলো সেই কৌটাটা। কৌটার নমুনার মাঝে ছিল অতি বিশাল পারমাণবিক ভরের একটা উপাদানের প্রমাণ। ভাবলাম, স্কাইলস! যতীন বলল, যাচ্ছে যাও, তবে চেষ্টা করে 'খ'-বাক্স থেকে কিছু নতুন নমুনা সংগ্রহের।

মার্চের শেষে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ইউটা স্টেটের সল্ট লেক সিটিতে গেলাম। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলাম দক্ষিণে, উঠলাম ১৫ নম্বর ইন্টারস্টেট রাস্তায়, তারপর ৫০, তারপর স্টেট রাস্তা ৮৯। রাস্তা ৮৯-এর দুপাশে সুন্দর সাজানো খামার, খড়ের গাদা, তৃণভূমি, তাতে চলছে ঘোড়া, তৃণভূমির বুক চিরে বয়ে চলেছে ছোট নদী। খামারের পেছনে পাহাড়, বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে পাহাড়ের লাল পাথরের পাশে তুষারের সাদা রঙ। ৮৯ থেকে ১২। ১২ থেকে যখন দক্ষিণে মোড় নিলাম হোল ইন দি রক রোড বা 'গর্তভরা পাথুরে পথে' ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে (ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার পূর্বতীর থেকে আগত লোকেরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করতে ডিনামাইট দিয়ে পাথরের মধ্যে গর্ত করে, সেই থেকে এই রাস্তার নাম)। ইসাবেলের দিকনির্দেশনা অনুসারে সেই রাস্তায় গেলাম ৩৩ মাইল। পশ্চিমে একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকলাম— আরো ছ-মাইল। হোল ইন দি রক রোড-এ কোনো গাড়ি চোখে পড়েনি, শীত শেষ হচ্ছে, গ্রীষ্মের আগে এদিকে কেউ বেড়াতে বা ব্যাকপ্যাকিং (বা ট্রেকিং) করতে আসে না।

রাস্তা শেষ হয়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে উত্তরে তাকাই। চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় নিচে, অনেক নিচে, চিকচিক করে একটা ছোট রুপালি রেখা, এস্কালান্তে নদী। ইসাবেলের মানচিত্র অনুযায়ী আমাকে নিচের গিরিখাতে নামতে হবে, তারপর এস্কালান্তে পার হয়ে আরেকটা গিরিখাতে ঢুকতে হবে। দুদিন, হয়ত বা তিন দিন লাগবে।

সেই রাতে তাঁবু খাটালাম মালভূমির একেবারে কিনারে, গিরিখাতের ওপরে। জ্যোৎস্না সত্ত্বেও আকাশে জ্বলজ্বল করে কালপুরুষের দেহ। কাঁধের দুটি তারা লাল আর্দ্রা এবং নীল বাণরাজা খুবই উজ্জ্বল। কোমরের তিনটি তারা হলো অনিরুদ্ধ, ঊষা ও চিত্রলেখা। জানি কোমরের তারাগুলোর নিচে রয়েছে কালপুরুষের নীহারিকা, প্রায় ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরের সেই গ্যাস নীহারিকায় জন্ম নিচ্ছে নতুন নক্ষত্রেরা। ভাবি ইসাবেলের মানুষেরা কি এই

রকম নীহারিকার কাছে তাদের বাসস্থান বেছে নেবে? তারা কি সবেমাত্র জন্ম নেয়া দীপ্তিমান নক্ষত্রদের শক্তি আহরণ করতে পারবে? ইসাবেলের মানুষ বলছি কিন্তু ইসাবেলরা কি সত্যি আমাদের মতো দেখতে? ইসাবেলকে সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে আমাকে কোনো সদুত্তর দেয়নি। হয়ত তার উত্তর দেবার সময় হয় নি। হয়ত এক ঝড়ের রাতে সমুদ্রে সাঁতার কেটে ইসাবেল উঠে গিয়েছিল কিউবার জাহাজে এক নীল বাক্স নিয়ে? পরাশক্তির দ্বন্দ্বে কী কাজ সেই বাক্সের? মহাসমুদ্রের নিচে অন্য দেশের ডুবোজাহাজের গতিবিধি নির্ধারণ করা, কিংবা শক্তিশালী সোনার, রাডার আর কম্পিউটার দিয়ে শত্রুর হঠাৎ ছোড়া মিসাইলকে খুঁজে পাওয়া?

ঠাণ্ডা পড়ে, জ্যাকেট পরে নিই। হোল ইন দ্য রক রাস্তার দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসে। আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে। শব্দটা ক্রমে কাছে আসতে থাকে, তারপর হঠাৎই থেমে যায়। পথের মধ্যখানে কারো থামার কথা নয়, কারণ সেখান থেকে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বিরল পর্যটক? স্কাইলস? স্থানীয় দুর্বৃত্ত? আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আর কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, সবকিছু নিঃশব্দ নিঝুম। আর অপেক্ষা না করে তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম।

দিন ৪৬. এস্কালান্তে গিরিখাত

পরদিন উঠে পড়লাম সূর্যোদয়ের আগে। রাতে তাঁবুর আশপাশে, নিচের গিরিখাত ছাপিয়ে ওপাড়ের পাহাড়ে একটা মিহি তুষারের স্তর পড়েছে যা কিনা রোদের আলোয় দুপুরের আগে মিলিয়ে যাবে। ছোট একটা স্টোভ জ্বালিয়ে কফি করে খেলাম। কাল রাতে যার গাড়ির শব্দ শুনেছি সে যেন আবার দেখতে না পায় এই ভাবতে ভাবতে আমার ব্যাকপ্যাকে ভরে নিলাম চার-পাঁচ দিনের খাবার, স্টোভ, তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, ক্যামেরা, বাইনোকুলার আর দু-একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। গাড়িটা অবশ্য আমি লুকাতে পারব না। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হলাম, গাড়ির কাছেই একটা পথ খুঁজে পেলাম নিচে নামবার।

গিরিখাতের তল পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে। নিচে নেমে বাইনোকুলার দিয়ে ওপরের পথটা দেখলাম। নামার পথটা পুরোটা দেখা গেল না, তাই কেউ আমার পিছু নেয়নি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। ওপরের তুলনায় ক্যানিয়নের ভেতর বেশ উষ্ণ। ক্যানিয়নের ধারে কিছু ঝোপ, দু-একটা জুনিপার জাতীয় গাছ, লালচে পাথর। চার ঘণ্টা হাঁটার পর এস্কালান্তে নদীর দেখা পেলাম, হাঁটুজল, খরস্রোতা। সাবধানে পার হলাম, জুতো ভিজে গেল। নদীর এই পারে ছিল কিছু কটনউড গাছ, খাড়া প্রায় মসৃণ লাল

পাথরের দেয়াল উঠে গিয়েছিল হাজার দেড়েক ফুট ওপরে। মাঝে মাঝে দু-একটা গিরগিটি ছাড়া এখানে প্রাণিজীবনের ছায়া নেই। একটু বসে গতকালের তৈরি একটা স্যান্ডউইচ খেলাম, তারপর আবার ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পরে ইসাবেলের নির্দেশিত আর একটা গিরিখাত চোখে পড়ল, তার ওপর দিয়ে রয়েছে একটা আর্চ, অর্ধ চন্দ্রাকৃতি পাথরের সেতু। এই অঞ্চলে এ রকম আর্চ প্রচুর, বৃষ্টিতে বাতাসে হাজার বছর ধরে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই রকম আর্চ।

আরো ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁবু খাটালাম। সে রাতে যখন চাঁদ উঠল তখন গিরিখাতের ওপর দিয়ে বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর কোনো শব্দ কি শোনা যাচ্ছিল? ভাবলাম আমি এক প্রাচীন আদিবাসী পুয়েবলো আমেরিকান ইন্ডিয়ান, শিকারের খোঁজে সেই নিঝুম গিরিখাতে ঢুকেছি, কিন্তু পথ হারিয়ে আমার গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে গেছি। হঠাৎ মনে হল ওপরে—গিরিখাতের ওপরে একটা আলোর রেখা মুহূর্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। টর্চের আলো? চোখের ভুল? গতকাল যে গাড়ির শব্দ শুনেছিলাম তার চালক কি এখনো ওপরে আছে।

দিন ৪৮. এস্কালান্তে গিরিখাত

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, সূর্যের আলো স্পর্শ করেছিল দূরে একটা পাহাড়ের চুড়ো যেটা গিরিখাত থেকে দেখা যাচ্ছিল। তাঁবু গুটিয়ে রওনা হলাম। মানচিত্র অনুযায়ী আর একটা ছোট গিরিখাতে ঢুকলাম যেখানে কোনো জল ছিল না। মাঝেমধ্যে দেয়ালে আঁকা ছিল আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের চিত্রলিপি যাকে পেট্রোগ্লিফ বলা হয়। গিরিখাতটা ধীরে ধীরে সরু হয়ে যেতে থাকল এবং শেষাবধি তার পরিসর এমনই হল যাতে একটা মানুষ মাত্র ঢুকতে পারে। মনে হল এখানে কোনোদিন কেউ আসেনি। লাল মসৃণ পাথরের ধার ঘেঁষে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা খোলা মাঠের মতো জায়গায়। আমার সামনে ছিল বিশাল প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটার যার বিস্তার হবে প্রায় এক কিলোমিটার। দেবতাদের নাট্যালয়, মনে মনে বলি। লাল পাথরের বিশাল গিরিস্তম্ভ দিয়ে এমনভাবে সাজানো ছিল সেই নাট্যালয় যেন নিশি রাতে সেখানে নেমে আসে অশরীরীরা, তাদের গুরুগম্ভীর কিন্তু অদৃশ্য পদধ্বনিতে মুখর থাকে নির্জন ভূমি। ইসাবেলের মানচিত্র অনুযায়ী এই মুক্তাঙ্গনের পাশঘেঁষে বেরিয়ে গেছে এক সরু গিরিপথ যার শেষপ্রান্তে, প্রায় পাঁচ মাইল পথের পর, রয়েছে 'খ'-যন্ত্র। খুব শিগগির আবিষ্কার করলাম অ্যাম্ফিথিয়েটারের পরিসীমায় বেশ কয়েকটি গিরিপথ আছে যেগুলো মানচিত্রে দেয়া নেই। কম্পাস দিয়ে

ইসাবেলের গিরিপথের দিকটা নির্ধারণ করতে চাই, কিন্তু সেখানে খুব অল্প পরিসরে তিনটি গিরিখাতের মুখ আমাকে বুঝতে দেয় না সঠিক পথটা। সন্ধ্যা হতে তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি, আমি ভুল গিরিখাতে ঢুকলে অহেতুক দশ মাইল বাড়তি পথ হাঁটতে হবে। কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ক্যাম্প গাড়লাম সেই তিনটি গিরিখাতের ঠিক মধ্যেরটির সামনে। যদি আমার অনুমান সত্যি হয়, তবে 'খ'-যন্ত্র আমাকে জানাবে তার উপস্থিতি।

সে রাতে যখন আগুন জ্বালাই তার শিখায় আমার ছায়া কাঁপে দূর দেয়ালে। সাধারণত প্রকৃতির মাঝে আমি ভয় পাই না, তবে আজ ওই নির্জন নাট্যমঞ্চে যেন শুনতে পাই অস্পষ্ট কথা, হালকা পায়ের শব্দ—যেন হাজার বছরের মানুষের পদক্ষেপ প্রাণ পেয়ে নৃত্যরত হয়েছে সেই মুক্তাঙ্গন। শুকনো কাঠ আগুনে জ্বলে হঠাৎ শব্দ করে ওঠে, চমকে যাই, যেন দেখি আমার ছায়ার পাশে নাচছে আদিবাসী হোপি ওঝা। একটা গিরগিটি পাথরের ওপর থেকে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, মানুষের বোধ পায় প্রাণিজগৎ, প্রাণ পায় নিশ্চেতন প্রকৃতি। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে আমি থাকি একা এক মানুষ, বৃষ্টি পড়ে অবিরল এক বিষুবীয় বনে। আমি রেডিও অপারেটর, আমার কাছে বার্তা আসে বিপদের। হ্যালো, হ্যালো, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, বলি।

দিন ৪৮. এস্কালান্তে গিরিখাত

সে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আগুনের পাশেই। সকালে মনে হলো আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে, 'খ'-বাক্স আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। আবার বৃষ্টিমুখর বনে ফিরে গিয়েছিলাম রেডিও অপারেটর হয়ে, আমি সাহায্য করতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। 'খ'-যন্ত্র মাঝের গিরিপথ থেকে তার প্রভাবক্ষেত্র দিয়ে আমাকে বিষুবীয় বনে নিয়ে গেছে, সে বুঝেছে আমার উপস্থিতি। সে গিরিখাতের সামনে ক্যাম্প গেড়েছি, তার শেষে রয়েছে সেই বাক্স। রওনা হতে হতে ন'টা বেজে যায়। ঐ সকালে শুনতে পাই অনেক দূরে জেট প্লেনের শব্দ, ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশের প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে একটি উড়োজাহাজ, তার থেকে নির্গত ধোঁয়া শীতল উচ্চতায় স্ফটিক হয়ে যায়। পৃথিবী তাহলে বেঁচে আছে, আমি ভাবি।

সরু গিরিখাতের ভেতর দিয়ে চলি ঘন্টাদুয়েক। তারপর আবার পথ ছোট হয় যায়। মনে হয় অনেক দূরে বাজ পড়ে যার শব্দ ঢাকের গুড়গুড় ধ্বনির মতো ছড়িয়ে যায়, কিন্তু ওপরের এক চিলতে আকাশ থাকে খুবই পরিষ্কার। আরো ঘণ্টাখানেক পর পথ শেষ হয়ে যায় একটা খোলা জায়গায়।

বাঁ পাশে ছিল একটা ছোট খোলা গুহার মতো জায়গা, ব্যাকপ্যাকটা গুহার মুখে নামিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকি। গুহার মৃদু আলোয় তার ছাদ দেখা যায় প্রায় আট-নয় ফুট উঁচু। গুহার মাঝখানে একটা থামের মতো পাথর, তার পেছনের দেয়ালে বাক্সটা থাকার কথা। নয় ফুট ওপরে মনে হল একটা কুলুঙ্গির মতো জায়গা আছে, সেখানে বাক্সটা থাকতে পারে, দেখলাম হাত দিয়ে সেই জায়গার নাগাল পাচ্ছি না। ভাবি ইসাবেল এই জায়গাটা খুঁজে পেল কেমন করে?

দেয়াল আঁকড়ে ধরে প্রায় চার ফিট উঠলাম, কুলুঙ্গির মধ্যে দেখলাম একটা মাঝারি আকৃতির পাথর, তার পেছনে বাক্সটা থাকতে পারে। কোনো রকমে দু-তিনটে ছোট গর্তে পা রেখে শরীরটা টেনে তুললাম, কুলুঙ্গিটা আমার জন্য ছোট হলেও হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকতে পারলাম। নিচু হয়ে বসে বাঁ হাতটা পাথরের পেছনের দিকে বাড়াতেই বাক্সটা হাতে লাগল। বাক্সটা নিয়ে নিচে নেমে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এলাম।

বাক্সটা ছিল প্রথম 'খ'-যন্ত্রের মতই দেখতে। মসৃণ তল, তার মধ্যে রয়েছে শুধু একটা অস্বচ্ছ গোলাকার প্লাস্টিক জাতীয় জানালা, যেখানে ইসাবেল আমাকে লেজার রশ্মি তাক করতে বলেছিল। কলমের মতো লেজারটা বের করলাম। লেজারের ওপরে লাল, নীল ও বেগুনি রঙের তিনটা বোতাম। ইসাবেল লিখেছিল তিনবার অবলোহিত, দুবার দৃশ্যমান ও একবার অতিবেগুনি বোতাম টিপতে। ভেবেই রেখেছিলাম লাল বোতামটা হচ্ছে অবলোহিত, সবুজটা দৃশ্যমান ও নীলটা হচ্ছে অতিবেগুনি। তবে 'ক'-মহাবিশ্ব যদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই পৃথিবীর মতো হয়ে থাকে তবে এই ধরনের রঙ একইভাবে সেখানে অনুভূত হবে। স্কাইলস বলেছিল, বাক্সটা বিস্ফোরিত হতে পারে! কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবতে চাইলাম না। আমি বাক্সের জানালাটার দিকে লেজার তাক করে তিনবার লাল বোতামটা টিপলাম।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে পুরো গিরিখাতটা ভরে গেল। গুমগুম আওয়াজ। শব্দটা বেড়েই চলল। 'খ'-বাক্স থেকে শব্দ আসছিল না। আতঙ্কিতভাবে চারদিক তাকালাম, কিন্তু সে রকম কিছুই চোখে পড়ল না। এবার দুবার লেজারের নীল বোতামটা টিপলাম। শব্দটা আরো বাড়ল, সেটা গভীর থেকে গভীরতর হলো। মনে হল একটা জেট বিমান রানওয়ে ধরে আমার দিকে এগুচ্ছে। তারপর বুঝলাম উত্তর দিক থেকে শব্দটা আসছে। সেটা বুঝতে বুঝতেই চোখে পড়ল কারণটা। উত্তরে গিরিখাতের পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ফাটল দিয়ে বিশাল গতিবেগের কয়েকটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তার মধ্যেই জলপ্রপাত হয়ে গেল জলোচ্ছ্বাস, সেই জল প্রবল বেগে আমার দিকে ছুটে এল। হাতে সময় নেই, এই জলে গুহাটাও ডুবে যাবে। বাক্স নিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে

শুরু করলাম, আমার ব্যাকপ্যাক পড়ে রইল গুহার বাইরে। আমাকে ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে হবে, কিন্তু বাক্স নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। প্রায় ছ'ফুট উচ্চতার জল আমাকে ধরে ফেলেছে। আমি বাক্সটা ফেলে দিলাম। প্রথমে একটা পাথরে লাফিয়ে উঠে দু'হাত ও দু'পা ব্যবহার করে একটা ফাটল ধরে পনেরো ফুট মতো ওপরে উঠতে পারলাম। জল বাক্সটা ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমার পক্ষে নিচে নামা আর সম্ভব নয়, সেখানে বয়ে চলেছে এক নদীর মতো জলধারা। গিরিখাতের ওপরে পৌঁছতে হলে আরো প্রায় হাজার ফুট উঠতে হবে। আমি রক ক্লাইম্বার নই, এ রকম খাড়া পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। নিচের জলপ্রবাহ কতক্ষণ থাকবে সেটাও বুঝছিলাম না। এখন বুঝলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বহু দূরে যে বজ্রপাতের শব্দ শুনেছিলাম তা ছিল বৃষ্টির পূর্বাভাস, আর দূরের বৃষ্টির জলই অতর্কিত বন্যার ধারা হয়ে এই ক্যানিয়ন দিয়ে বয়ে চলেছে। মনে পড়ল এই রকম বন্যার ধারায় এই ধরনের গিরিখাতে বহু পর্যটক প্রাণ হারিয়েছে।

ধীরে ধীরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। এখানকার মাটি বা পাথর হচ্ছে মূলত স্যান্ডস্টোন– লালচে হলুদ তার রঙ। হাত দিয়ে কোনো একটা ফাটল বা গর্তের খোঁজ করছিলাম যা অবলম্বন করে ওপরে উঠতে পারি। কিন্তু অনেক সময়ই পাথর ভেঙে যাচ্ছিল। মাত্র একশ ফুট উঠতে আমার ঘণ্টাখানেক লাগল। কিন্তু এরপরে পথটা একটু সহজ হয়ে গেল, আরো তিন ঘণ্টা পরে উঠে এলাম গিরিখাতের ওপরের মালভূমিতে। ওপরে উঠে নিচে ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে জলের স্রোতধারাটা দেখলাম, এখন সেটা অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। বাক্সটা গিরিখাত পার হয়ে যে কোথায় চলে গেছে সেটা ভাবতে চাইলাম না। এত কষ্ট করার পরও ইসাবেলের কথা রাখা গেল না।

আমার ব্যাকপ্যাক জলে ভেসে গেল, আমার কাছে জল, স্লিপিং ব্যাগ, তাঁবু, খাবার এগুলো কিছুই নেই। এস্কালান্তে ক্যানিয়নের কোথায় আছি সেটাও বলতে পারব না।

মিস্টার আ., তাহলে আপনার দেখা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

কে? চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। সুদূর গিরিখাতের ওপর আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জেরার্ড স্কাইলস। স্কাইলস তার বাদামি ওভারকোট পরে আছে, মাথায় বাদামি হ্যাট। এটা অসম্ভব, ভাবি, স্কাইলস কোনোভাবেই এখানে আসতে পারে না! আজ নিয়ে তিন দিন নিচের ক্যানিয়নে হাঁটছি আমি, প্রায় পঁচিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি, কোনো মানুষের চিহ্ন দেখি নি। কিন্তু স্কাইলস কত অনায়াসে আমাকে অনুসরণ করল, সঠিক সময়ে

ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল! মনে পড়ল হোল ইন দি রক রোডে গাড়ির আওয়াজ, গিরিখাতের ওপর টর্চের আলো। ঝানু গোয়েন্দা স্কাইলস, আমি ভাবি, কিন্তু তিন দিন হেঁটে আমাকে যে জায়গায় পৌঁছুতে হয়েছে সে এত সহজে সেখানে এলো কেমন করে?

আ., আপনি হাতে পাওয়া বাক্সটা ফেলে দিলেন? স্কাইলসের গলায় শ্লেষ। আমার আশ্চর্য হওয়ার যেন শেষ নেই। নিচে গিরিখাতের তল এখান থেকে দেখার জো নেই! স্কাইলস তবু জেনেছে আমি বাক্সটা খুঁজে পেয়েছিলাম।

আপনাকে ধন্যবাদ, স্কাইলস বলতে থাকে, বাক্সটার সন্ধান আপনি আমাদের দিলেন। ওটা খুঁজে পাওয়া ছিল খুবই জরুরি।

বুঝতে পারি না আমাদের বলতে স্কাইলস কাকে বোঝায়? এফবিআইকে নাকি 'ক' মহাবিশ্বের দলছুট লোকদের? আমি জানি বাক্সটা আপনি কেন খুঁজছিলেন, স্কাইলস বলে। আমরা আন্দাজ করেছিলাম, ইসাবেল আপনাকে বাক্সের সন্ধান দিয়ে যাবে। আপনার কাজ আপনি করেছেন, দুঃখের বিষয় হচ্ছে আপনাকে এই জন্য কোনো যথাযথ পুরস্কার দিতে পারব না।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, স্কাইলস দুহাত পেছনে রেখে কথা বলছিল। এখন হাত দুটো সামনে নিয়ে এলে দেখলাম এক হাতে ধরা আছে রিভলভার। কোনো এফবিআই এজেন্ট আমাকে গুলি করে মারবে এটা আমার বিশ্বাস হলো না। স্কাইলসকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু বাক্সটা তো আপনারা পাচ্ছেন না? স্কাইলস বলে, সেই চিন্তা আপনাকে আর করতে হবে না। আমি এসব কিছুর জন্য খুবই দুঃখিত, ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ বা আক্রোশ নেই। বলতে পারেন একটা মহত্তর কাজের জন্য আপনাকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। আপনি নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন, সেটা আপনার দুর্ভাগ্য।

আমি তবু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না স্কাইলস আমাকে মেরে ফেলবে। এফবিআই যদি বাক্সটা কিউবানদের হাতে পড়বার জন্য চিন্তিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে মেরে ফেলে তাদের কোনো লাভ হবে না। বরং আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে ইসাবেল সম্পর্কে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে। 'ক'-মহাবিশ্ব তাহলে অলীক নয়।

আর বাক্সটা, বাক্সটা নিয়ে কী করবেন আপনি? আমি কথা বলতে পারি না, হৃৎপিণ্ডের আলোড়ন সব কথা আটকে দেয়।

'খ'-যন্ত্রের কথা বলেছেন? 'খ'-যন্ত্র সম্পর্কে তো ইসাবেল আপনাকে বলেছেই। এই যে আমাদের বাক্স এসে গেছে। এই বলে স্কাইলস হাত দিয়ে গিরিখাতের ধারের দিকটা দেখাল। ঘুরে দেখলাম রিটা ম্যাকিন্টায়ার ক্যানিয়নের গহ্বর থেকে উঠে আসছে। রিটা ম্যাকিন্টায়ার? এবার খেয়াল করলাম গিরিখাতের কিনারে পাহাড়ে ওঠার দড়ি পাথরের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। ম্যাকিন্টায়ার সেই দড়িকে অবলম্বন করেই উঠেছে, তার পিঠে একটা ব্যাগ। ম্যাকিন্টায়ার পরেছিল রক-ক্লাইম্ব করার পরিচ্ছেদ। সে উঠে আমার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। এমন যেন আমার সেখানে থাকবারই কথা ছিল। পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে সে 'খ'-যন্ত্রটা বের করল। আমার বোধ হয় আজকে বিস্ময়ের শেষ নেই, বন্যার জল থেকে রিটা ম্যাকিন্টায়ার বাক্স উদ্ধার করে এনেছে!

স্কাইলস আমার দিকে তার পিস্তল তাক করল। সে বলল, বিদায় আ. আমি দুঃখিত যে এভাবে আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে। আমার করার কিছুই ছিল না, অসহায় দৃষ্টিতে, কিছুটা সম্মোহিত হয়ে পিস্তলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত কিছুর পরে এত সহজে স্কাইলস আমাকে মেরে ফেলবে সেটা মানতে চাইলাম না। এটা যেন কোনো বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য মুহূর্ত ছিল না। সেই মুহূর্তে ম্যাকিন্টায়ার স্কাইলসের দিকে 'খ'-বাক্সটা ছুড়ে দিল। স্কাইলস এটা আশা করেনি, সে হতচকিত হয়ে পিস্তল ফেলে দিয়ে বাক্সটা দুহাত দিয়ে ধরে ফেলল, কিন্তু ভারসাম্য না রাখতে পেরে গিরিখাতের প্রায় কিনারে চলে যেতে লাগল। ম্যাকিন্টায়ার চিৎকার করে উঠল, আ.! লেজার! লেজার! দেখলাম স্কাইলসের হাতে বাক্সটার ওপরের ছোট গোল জানালাটা দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে দ্রুত লেজারটা বের করে বেগুনী বোতামটা টিপলাম। লেজারের রশ্মি বাক্সের জানালায় লাগল কিনা বুঝতে পারলাম না, তার আগেই বাক্সসমেতো স্কাইলস গিরিখাতের গহ্বরে পড়ে গেল।

দৌড়ে গিরিখাতের ধারে গেলাম, কিন্তু প্রায় হাজার ফুট নিচে তল দেখতে পেলাম না। রিটা ম্যাকিন্টায়ার দৌড়ে এল না, ধীরে হেঁটে এসে সে নিচে তাকায়, আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, তার হাসি নিয়ে আসে পূর্ব পরিচিতির ইঙ্গিত। আমার বিস্মত চোখ ম্যাকিন্টায়ারকে প্রশ্ন করে, এসবের মানে কি? ম্যাকিন্টায়ার আবার হাসে, তারপর বলে আমার গাড়ি এখান থেকে খুব দূরে নয়, মাইল ছয়েকের পথ, তারপর আপনাকে আমি হোল ইন দি রক রাস্তায় পৌঁছে দিতে পারি।

আমি বললাম, আর স্কাইলাস? ম্যাকিন্টায়ার বলে, স্কাইলসকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্কাইলস চলে গেছে যেখানে যাওয়ার সেখানে। বললাম, আর এফবিআই? সে বলল, এফবিআইকে নিয়েও চিন্তা করবেন না, এফবিআই স্কাইলসকে চেনে না।

আমি ভাবি হয় স্কাইলসের দেহ পড়ে আছে ক্যানিয়নের নিচে, নয় স্কাইলস চলে গেছে 'ক'-মহাবিশ্বে। ম্যাকিন্টায়ারকে বলি, আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ম্যাকিন্টায়ার আমার দিকে তাকিয়ে হাসে (তার হাসি কি ইসাবেলের মতো?), উত্তর দেয় না, আমার জন্য অপেক্ষা করে না, সে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করে। সে বলে, আমাকে আপনার মনে নেই আ.? কুইবেকে আমাদের দেখা হয়েছিল। ইউটার সর্পিল গিরিখাত থেকে তুষারাচ্ছাদিত কুইবেকের স্মৃতি তখন অনেক দূরে তবু আমার মনে পড়ে কুইবেকের তুষার ঝড়ের সময় একজনকে গ্রে-হাউন্ড বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়েছিলাম– সেই এই রিটা ম্যাকিন্টায়ার।

আপনিই কি আমার গাড়িতে প্রথম 'খ'-বাক্সটা রেখে গিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ, বলে আবার হাসে ম্যাকিন্টায়ার। আপনি এবার সব বুঝে নিতে পারছেন। বললাম, না, কিছুই বুঝছি না। আপনি তাহলে এফবিআই-র লোক নন? ম্যাকিন্টায়ার বলে, না। এরপরে বেশ কিছুটা সময় কাটে মৌনতায় আমাদের পথটা। পরের প্রশ্নটা কীভাবে করব সেটা নিয়ে মিনিট দুই ভাবার পর বলি, তাহলে অন্য যে সম্ভাবনা সেটা হল আপনি 'ক'-মহাবিশ্বের লোক। ম্যাকিন্টায়ার আমার সামনে, আমি তার মুখ দেখতে পাই না, তবু তার উত্তরে বুঝি সে হাসছে। সে বলে, আমি আগেই বলেছি, আপনি সব জানেন। আর স্কাইলস? সেও 'ক'-মহাবিশ্বের? আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, উত্তর দেয় ম্যাকিন্টায়ার।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর আমরা থামি। ম্যাকিন্টায়ার তার বোতল থেকে আমাকে জল দেয়। ছায়ায় বসে সে বলে, 'ক'-মহাবিশ্ব থেকে আমরা চারজন আসি পৃথিবীতে। পীয়ের, ইসাবেল, স্কাইলস ও ম্যাকিন্টায়ার। পীয়ের আর ইসাবেল ছিল একটা টিম যাদের মূল দায়িত্ব ছিল 'খ'-যন্ত্রের পরিচালনা, কিন্তু স্কাইলস ছিল এই পুরো অভিযানের প্রধান। একটা কথা কি জানেন আ., পৃথিবীর মতো এ রকম একটা সুন্দর গ্রহ এই গ্যালাক্সিতে খুঁজে পাওয়া খুব কষ্ট কর, এমনকি আমাদের সভ্যতা যে গ্রহ থেকে শুরু হয়েছে সেটাও এমন সুন্দর নয়। আপনাদের ছোট এই গ্রহে এত বৈচিত্র যা এই পুরো গ্যালাক্সির ঈর্ষার বস্তু হতে পারে।

যাক সে কথা, বলতে থাকে ম্যাকিন্টায়ার, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হল স্কাইলস কখনোই অন্য সভ্যতার মূল্য দিত না। স্কাইলস এই অভিযানের প্রধান হয়েছিল কারণ সে 'খ'-যন্ত্রে প্রতিলিপি সৃষ্টি করার কারিগরি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল। আমি জানি না ইসাবেল আপনাকে বলেছে কিনা 'খ'-যন্ত্র নিজের প্রতিলিপি বা নকল তৈরি করে অন্য মহাবিশ্বে পাঠায় সেই মহাবিশ্বের প্রকৃতি বিচারের জন্য। স্কাইলসের হয়ত ইচ্ছে ছিল যে

অন্য মহাবিশ্বের আর একটি সুবিধাজনক গ্রহের সন্ধান পেলে সেটা পুরোপুরি দখল করে নেবে, সেই গ্রহে কি ধরনের প্রাণ বা সভ্যতা আছে তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু আমাদের টাইপ-৩ সভ্যতা মহাবিশ্বে সব ধরনের প্রাণকে মূল্য দেয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বে প্রাণের চিহ্ন বিরল, তাই আমরা প্রতিটি প্রাণ ও সভ্যতার নিজস্ব অভিব্যক্তিতে বাধা দিই না। কাজেই অন্য সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে বা অধিকার করে আমাদের সভ্যতা প্রলম্বিত করা কখনই আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমাদের কর্তৃপক্ষ স্কাইলসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম থেকে সন্দেহ প্রকাশ করে, তাই তার ওপর নজর রাখার জন্য আমাকে বেছে নেয়া হয়। আমার প্রথম কাজ ছিল স্কাইলসকে বিশ্বাস করানো যে আমি তার মতাদর্শী।

আশ্চর্য হয়ে ম্যাকিন্টায়ারের দিকে তাকাই। তার কাহিনী ছিল ফ্রানজ কাফকার অ্যাবসার্ড গল্পের মতো, যে গল্পের ছক এক অদ্ভুত যুক্তি বা যুক্তিহীনতা থেকে আর এক অদ্ভুত অলীকতায় বিচরণ করে। মহাজাগতিক প্রহেলিকা, ভাবি, ম্যাকিন্টায়ারের সঙ্গে ইসাবেলের মিল রয়েছে কোথায়? কালো আর সোনালি চুলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনে পড়ে পীয়ের চেয়েছিল এক সোনালি চুল মেয়েকে রাইড দিতে ভারমন্টে। সেই কি রিটা ছিল? আমরা উঠে পড়ি, একটা গভীর খাদের পাশ দিয়ে হাঁটি।

ম্যাকিন্টায়ার বলে, আমি নিজেকে দলভুক্ত করাই সামাজিক পর্যবেক্ষক হিসেবে, আমার কাজ হবে নতুন গ্রহের সমাজ পর্যবেক্ষণ করা। স্কাইলস আমার দলভুক্তিকে সমর্থন করে, সে ভেবেছিল এই অভিযানে আমি হব তার ডান হাত। আমি ভালোভাবেই যে আমার দায়িত্ব পালন করেছি সেটা আপনি নিজেও দেখেছেন, ম্যারিল্যান্ডে পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি ছিলাম স্কাইলসের সহকারী। আমার ভয় ছিল যে, আপনি আমাকে চিনে ফেলতে পারেন, তাই আমি সব সময় জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।

আপনাকে আমার খুব চেনা লাগছিল, বলে উঠি, তা ছাড়া জানালার পাশে আপনার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমাকে ইসাবেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের পদশব্দের মধ্যেও মনে হয় আমি ম্যাকিন্টায়ারের দীর্ঘশ্বাস শুনি। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বলে, 'ম'-মহাবিশ্বে ঝাঁপ দেয়ার সময় কিছু কারিগরি ত্রুটি ঘটে, পীয়েরের স্থানান্তর হয় না ঠিকমতো, পীয়েরের সচেতন মন ভুলে যায় যে সে 'ক'-মহাবিশ্বের লোক। ইসাবেল ও আমি অনেক চেষ্টা করি পীয়েরের মস্তিষ্ককে পুনর্গঠিত করতে। আপনি নিজেই দেখেছেন আমাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিই পীয়েরকে 'ক'-মহাবিশ্বে ফেরত পাঠানোর, সেখানে তাকে সারিয়ে তোলা যেত; কিন্তু সেই জন্য আমাদের ফ্লোরিডা

যাওয়ার দরকার ছিল। পীয়েরের মস্তিষ্ক বিকৃতি স্কাইলসকে প্রথম থেকেই উল্লাসিত করে, তার জন্য ছিল এটা অযাচিত একটা পুরষ্কার। পীয়েরকে 'ক'তে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটা করতে হয়েছিল স্কাইলসের অজান্তে। ইসাবেল ও আমি একটা পরিকল্পনা করি, ফ্লোরিডার একটা নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিই দুটো মহাবিশ্বের মধ্যে একটা যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য।

রিটা ম্যাকিন্টায়রের কথায় আমার মনে পড়ে গাড়ি জলে পড়ে যাওয়ার আগে আকাশ চিড়ে সেই বিদ্যুতের চমক, সত্যিই কি 'ক' উঁকি দিয়েছিল আমাদের মহাবিশ্বে, সত্যিই কি ইসাবেল ফিরে গেছে তার মহাবিশ্বে?

হঠাৎ একটা বিশাল পাথরের দেয়ালের সামনে পড়ি আমরা। ম্যাকিন্টায়ার বলে, এই দেয়াল বেয়ে উঠতে হবে আমাদের, তবে ভয় পাবেন না, দেয়ালের খাড়া জায়গাগুলোয় দড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি ম্যাকিন্টায়ারের দূরদর্শীতা আর শারীরিক ক্ষমতায় আশ্চর্য হই, গিরিখাতের গহ্বর থেকে যত অনায়াসে সে বাক্সটা নিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল সেটা পৃথিবীর খুব কম লোকই পারবে। তার নির্দেশমতো আমি সহজেই দেয়ালের ওপরে একটা ছোট মালভূমিতে উঠে যাই।

ম্যাকিন্টায়ার বলতে থাকে, ইসাবেলের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা করি যে বাক্সটা নিয়ে ফ্লোরিডা যাওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু পীয়েরকে নিয়ে তো আমরা যেতে পারব না, সেটা স্কাইলস দেখে ফেলবে। আমাদের প্ল্যান ছিল প্রথম দফায় বাসে করে বোস্টন যাব, আর ইসাবেল পীয়েরকে নিয়ে আলাদাভাবে বোস্টন যাওয়ার চেষ্টা করবে। আপনি যখন আমাকে গ্রে-হাউন্ড বাসস্ট্যান্ডে রাইড দিলেন তখন আপনার গাড়ির মার্কিন লাইসেন্স প্লেট দেখে আপনাকে আমাদের কাজে লাগানোর ধারণা আমার মাথায় আসে। আমাকে নামিয়ে দেয়ার পরে একটা ট্যাক্সি করে আপনাকে হোটেল পর্যন্ত অনুসরণ করি। গাড়িটা কোথায় পার্ক করলেন সেটাও দেখে যাই। সেই রাতে ইসাবেল ও আমি মিলে আপনার গাড়ি খুলে রেজিস্ট্রেশন কার্ড থেকে আপনার ঠিকানা জেনে নিই। বাক্সটাও গাড়ির পেছনের সিটে রেখে যাই। এছাড়া রেখে যাই ইউটা আর আরিজোনার স্লট ক্যানিয়নের পরিচয়বহ একটা কাগজ। এসব করার জন্য আমি দুঃখিত, আ.।

না, না, ঠিক আছে, বলি আমি। ইসাবেল ও ম্যাকিন্টায়ার এক সবিস্তার পরিকল্পনায় আমাকে ব্যবহার করেছে, তবে সেটা আমাকে একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ করে দিয়েছে (যদিও সেই অ্যাডভেঞ্চারে আমার জীবন কয়েকবার বিপন্ন হয়েছে)।

ম্যাকিন্টায়ার বলতে থাকে, পরের দিন ইসাবেল পীয়েরকে নিয়ে আপনার গাড়ি অনুসরণ করে, তারপর আপনাকে টপকে পীয়েরকে পথে নামিয়ে দেয়। আপনি পীয়েরকে তুলে নেন। পীয়েরের অবশ্য এই পুরো অভিযানটার ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না, সে ড্রামন্ডভিলে নেমে যায়, যদিও পীয়েরকে ইসাবেল বলে দিয়েছিল আমেরিকা যেতে। বুঝতেই পারছেন এটা আমাদের প্ল্যানে ছিল না, তবে ইসাবেল আপনার গাড়ির পেছনেই ছিল, সে পীয়েরকে তুলে নিয়ে আমাকে ফোন করে কুইবেকে, আমি আর একটা গাড়ি করে চলে আসি আপনাকে খুঁজতে। এই শেষের কাজটিও আমাদের নকশায় ছিল না, কারণ আমার অনুপস্থিতি স্কাইলসের চোখে পড়ুক সেটা আমরা চাইনি। ঐ রাতে ইসাবেল ও আমি আপনাকে খুঁজে পাই এক কবরস্থানে। 'খ' বাক্সই তার উপস্থিতি জানান দেয়। 'খ'-বাক্সের কাছাকাছি এলে যে তার উপস্থিতি বোঝা যায় সেটা আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্নের মাধ্যমে এতদিনে ধরতে পেরেছেন।

আমার মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা। গাড়ির জানালায় অন্ধকারে ঢাকা দুটি মুখাবয়ব এক দৃষ্টিতে দেখছিল আমাকে, অথচ তাদের চোখ আমি দেখিনি, তাদের চোখ ছিল কিনা বলতে পারব না। ম্যাকিন্টায়ার বলে, সকালে পীয়েরকে আমরা নামিয়ে দিই কবরস্থানে পাশে। পীয়েরকে বেশিক্ষণ একা রাখা যাবে না বুঝতে পেরে আমি ভারমেন্টে চেষ্টা করি আপনার গাড়িতে লিফট নিতে, কিন্তু দুজন অপরিচিতকে গাড়িতে একসাথে নিতে আপনি অস্বীকৃতি জানান।

কাচের জানালার পেছনে লাল জ্যাকেটের ওপর সোনালি চুলের ঝলক মনে পড়ে আমার। সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে, রাঙা হয়ে যেতে থাকে পাহাড় তার খাঁজগুলোকে মূর্ত করে। ম্যাকিন্টায়ার বলতে থাকে, এরপরে আমি চলে যাই কুইবেকে যাতে স্কাইলস আমার অনুপস্থিতি বুঝতে না পারে। ইসাবেল পীয়েরের সাথে আবার বোস্টনে দেখা করে এবং তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ হয়, স্কাইলস ইসাবেল ও পীয়েরের সন্ধান পায়। ওয়াশিংটনের বেল্টওয়েতে সে একটা দুর্ঘটনা ঘটায় যাতে পীয়ের পরে মারা যায়। স্কাইলসের উদ্দেশ্য ছিল 'খ'-বাক্সটা হাতানো, কিন্তু ইসাবেলের গাড়িতে সেটা ছিল না। আপনি যে পরবর্তীকালে ইসাবেলকে এতখানি সাহায্য করবেন সেটা স্কাইলস বোঝেনি। বুঝলে আপনাকে আজ এখানে থাকতে হত না। তবে একটা বিষয়ে আমরা সফল হয়েছি, স্কাইলস আপনাদের ফ্লোরিডা যাওয়া সম্পর্কে কিছু জানত না, কি-ওয়েস্টে আপনার গাড়ির দুর্ঘটনার খবর পুলিশের মাধ্যমে পাওয়ার আগে আমাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না।

ম্যাকিন্টায়ার বর্ণিত ঘটনাক্রমকে আমি আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই, কিন্তু কুয়াশার মাঝে ট্রেন যখন কোনো স্টেশন পার হয়ে যায় তার যাত্রীর কাছে স্টেশনের নাম থাকে অজানা, সেই রকম এই অভিযানের অনেক অংশই রয়ে যাবে আমার কাছে অবোধ্য। অনেক দূরে একটা স্যান্ডস্টোনের অর্ধবৃত্ত দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে ম্যাকন্টায়ার বলে, আপনাকে ফ্লোরিডা টেনে নিয়ে যাওয়া আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না, তবে পীয়েরের মৃত্যুর পর ইসাবেলের হাতে অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলে, তা ছাড়া ইসাবেল আপনাকে প্রথম থেকেই বিশ্বাস করেছিল। ম্যাকিন্টায়ারের মুখ দেখতে পাই না, সে আমার বেশ কিছু সামনে চলেছে। ইসাবেলের কালো চশমা মনে পড়ে, তার পেছনের কালো চোখ কি পৃথিবীর আ.কে সেই বইয়ের দোকানে দেখেই বিশ্বাস করেছিল? ম্যাকিন্টায়ারের চোখের রঙ আমি খেয়াল করিনি।

একটা ছোট টিলার পেছনে বাঁক নিতেই আধকিলোমিটার মতো দূরে ম্যাকিন্টায়ারের গাড়ি দেখা যায়। তাকে প্রশ্ন করি, আর দ্বিতীয় 'খ' -বাক্সটা?

ম্যাকিন্টায়ার উত্তর দেয়, কথা ছিল যে পৃথিবী থেকে যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয় তবে 'ক'-মহাবিশ্ব থেকে একটা বাড়তি 'খ'-যন্ত্র পাঠানো হবে পৃথিবীতে এই জায়গায়। তবে ঠিক কোন জায়গায় পাঠানো হবে সেটা শুধু ইসাবেল আর পীয়ের জানতো। ইতিমধ্যে 'ক' থেকে 'ম'তে ঝাঁপ দেয়ার সময়ে স্কাইলসের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন হয়, সে পৃথিবীকে 'ক'-মহাবিশ্বের প্রথম স্টেশন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে এটা হতে পারে, ম্যাকিন্টায়ার পরের কথাগুলো বলার আগে ভাবে, যে পৃথিবীর অধিবাসীদের দেখে স্কাইলস এমনই হতাশ হয়েছিল যে পৃথিবীকে মানুষের জন্য সংরক্ষণের কথা সে ভাবেনি। তবে সে জানত ইসাবেল কখনোই তার প্রস্তাবে সায় দেবে না, আর পীয়েরের জ্ঞান থাকলে তার নিজের জীবন দিয়ে তার বিরোধিতা করবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই হল— পীয়েরকে স্কাইলস হত্যা করল। স্কাইলসের নকশা ছিল ইসাবেল আর পীয়েরকে মেরে ফেলে আমাদের মহাবিশ্বে ফিরে যাওয়ার, সেখানে গিয়ে সে বলত ইসাবেল ও পীয়েরকে পৃথিবীর লোকেরা হত্যা করেছে। টাইপ-৩ সভ্যতা হলেও আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্কাইলসের কথায় চলবে এমন অনেক লোক আছে, পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া 'ক'-মহাবিশ্বের প্রজাতিদের জন্য হত স্বাভাবিক বিবর্তনের অঙ্গ।

ম্যাকিন্টায়ারের কথা আমার শরীরকে শীতল করে দেয়। ম্যাকিন্টায়ার বলে, ইসাবেলকে হারিয়ে স্কাইলস বা আমার 'ক'-তে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আমি যদিও জানতাম আর একটা 'খ'-যন্ত্র রয়েছে, তবে স্কাইলাসের দৃষ্টি এড়িয়ে আপনার কাছ থেকে তার সন্ধান জেনে নেবার সুযোগ আমার হয়নি। স্কাইলস আন্দাজ করেছিল 'ক' থেকে

দ্বিতীয় একটা 'খ'-যন্ত্র পীয়ের আর ইসাবেল এনে রেখেছিল। তাই ফ্লোরিডা থেকে আপনি ফেরার পর এফবিআই-র ছদ্মবেশে সে আপনাকে পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি সেই সময় তার বিশ্বস্ত সহকর্মীর দায়িত্ব পালন করি।

শেষ কথাটা বলে হাসে ম্যাকিন্টায়ার। আমরা ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সারা শরীর ঘর্মাক্ত, চাইছিলাম শুধু গা এলিয়ে দিয়ে একটু ঘুমাতে। তবু ঐ ক্লান্তির মধ্যে ম্যাকিন্টায়ারের কাহিনী আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। রিটার যেন কোনো ক্লান্তি নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে সে বলে, স্কাইলস আপনার ওপর ভালো নজর রেখেছিল, সল্ট লেকে যে আপনি আসছেন সেটা জানতো, সল্ট লেক আসার পরে প্লেনের লাগেজে দেয়া আপনার ব্যাকপ্যাকের ভেতরে স্কাইলস একটা পাতলা কাপড়ের মতো ট্রান্সমিটার সেঁটে দেয়, যেটা আপনার চোখ সহজেই এড়িয়ে যায়। এর ফলে আপনাকে আমরা সহজেই অনুসরণ করতে পারি, এমনকি এস্কালান্তে গিরিখাতে ঢোকার পরও ওপরের মালভূমি থেকে আপনার ওপর নজর রাখতে পারি।

তিনটে দিন স্কাইলস আমাকে ঠিকই নজরে রেখেছিল। দেখতে পায়নি সে আমাকে এস্কালান্তের গহ্বরে, তবে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ সে বুঝেছে, শিকারি শিকার ধরার অপেক্ষায় শুধু সময় শুনেছে। ম্যাকিন্টায়ার বলে, আপনার গিরিখাতে যে বন্যা আসবে সেটা আমরা বুঝেছিলাম। তার মিনিট চল্লিশ আগে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, মাত্র পনেরো মিনিটের বৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় নিচের সমস্ত গিরিখাত। এই বন্যা যেমন অতর্কিতে আসে তেমনি চলে যায় দ্রুত। আমরা এই ধরনের সমস্যাকে খুব ভালোভাবে মডেল করতে পারি, যেমন এই ক্ষেত্রে কখন জল নেমে যাবে এবং বাক্সটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটা আমাদের মডেল বলে দিতে পারে। তাই সঠিক জায়গা থেকে বাক্সটা তুলে আনতে আমার অসুবিধা হয় না।

সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যেতে থাকে, ম্যাকিন্টায়ার গাড়ি চালায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে। কাছের পাহাড়গুলোকে দিকচিহ্নবিহীন হয়ে আঁধারে মিলিয়ে যেতে দেখি। শুক্র গ্রহ জ্বলে ওঠে পশ্চিমে, পৃথিবীতে পড়ে থাকে দুটি মানুষ এক যানে। আর স্কাইলাস? স্কাইলসের দেহ কি পাওয়া যাবে খাদের নিচে? প্রশ্ন করি।

ম্যাকিন্টায়ার সাথে সাথেই উত্তর দেয় না, বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে, গাড়ির চলমান হেডলাইট আলোকিত করে এক অজানা পৃথিবী। ম্যাকিন্টায়ার ধীরে ধীরে বলে, আমার কাছে যে সঙ্কেতযন্ত্র আছে সেটা বলছে আপনি ঠিকভাবেই সবক'টা বোতাম টিপেছেন, কাজেই পূর্ব নির্ধারিত যান্ত্রিক সেটিং ঠিক থাকে তবে 'খ' যন্ত্র স্কাইলসকে নিয়ে

চলে গেছে 'ক'-মহাবিশ্বে।

পীয়ের, ইসাবেল আর স্কাইলস, এই তিনজন যেমন অতর্কিতে অনাহূত হয়ে এসেছিল আমার জীবনে, তেমনি হঠাৎ দ্রুত প্রস্থান করল। বুঝতে পারি না, এই প্রক্রিয়ার আমি কি ধরণের অনুঘটক। যার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে তারই এই পরিণতি হবে? ম্যাকিন্টায়ারের দিকে তাকাই, সে কি হবে চতুর্থ? ষড়যন্ত্রের ছ'টি যন্ত্র তাহলে পাওয়া গেল--নীল বাক্স, পীয়ের, ইসাবেল, ম্যাকিন্টায়ার, স্কাইলস আর আমি।

আর 'খ' -যন্ত্র? কি আছে সেই যন্ত্রের ভেতর? অবশেষে প্রশ্নটা করি।

আপনি ভাবছেন সেটা আমি জানি? ম্যাকিন্টায়ার বলে। আমার মনে হয় এক বিষাদপূর্ণ হাসি সে হাসে। ফ্লোরিডার পথে সারাটা সময়ই ইসাবেল বিষণ্ন ছিল, সে কি তখন একইভাবে হেসেছিল?

আঁকাবাঁকা রাস্তা পাহাড় ওপরে ওঠে, ম্যাকিন্টায়ার রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে আমাকে বলে, আপনারা বোধহয় ধরতে পেরেছিলেন যে 'খ'-যন্ত্রের মধ্যে একটা অতি ভারি মৌলিক উপাদান আছে, যা পৃথিবীতে নেই বা যা পৃথিবীর কোনো ল্যাবে নিকট ভবিষ্যতে তৈরি হবে না। অতি ভারি পারমাণবিক ভরের উপাদান তেজস্ক্রিয় হয়, কারণ তার নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জের প্রোটনের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে থাকে, 'শক্তিশালী' বা 'স্ট্রং' বল যা কিনা নিউক্লিয়াসকে ধরে রাখে সেটা তখন তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের কাছে পরাজিত হয়। বুঝতে পারি ম্যাকিন্টায়ার কী বলতে চাইছে, 'শক্তিশালী' বল শক্তিশালী হলেও খুব অল্প দূরত্বে কাজ করে, পরমাণু খুব বড় হলে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল (যার ব্যাপ্তি কিনা অসীম পর্যন্ত) একই চার্জের প্রোটন কণাদের একে অপরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

ম্যাকিন্টায়ার বলে, এই মৌলিক উপাদানের পরমাণুর ভর ১৭১। পৃথিবীর গবেষণাগারে যেসব কৃত্রিম উপাদান তৈরি হয়েছে সেগুলো খুবই তেজস্ক্রিয়, কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমার জানা মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি উপাদান হয়ত ১১০, কিছুটা বেশিও হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে তারা খুব শিগগিরই এসব অস্থায়ী উপাদান ছাড়িয়ে কিছু স্থায়ী উপাদান সৃষ্টি করতে পারবেন। ১৭১ নম্বর উপাদান যে, একেবারে স্থায়ী এমন নয়, সেটারও তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় হয়। আপনারা এর কিছুটা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। মাথা নেড়ে সায় দিই, যতীন আর আমি বাক্স থেকে আসা বিকিরণের মাত্রা গাইগার ও গামা কাউন্টার দিয়ে নির্ধারণ করেছিলাম।

রিটা বলে, আপনাদের ল্যাবে একটা কৌটায় 'খ' বাক্সের ওপর থেকে কিছু নমুনা রেখেছিলেন। স্কাইলস সেটা চুরি করে যাতে বিশাল পারমাণবিক ভরের প্রমাণ না থাকে, 'খ' বাক্সের বিশেষত্বের কোনো প্রমাণ যেন না পাওয়া যায়।

আর বাক্সের উজ্জ্বল নীল রঙ, ম্যাকিন্টায়ার বলতে থাকে, তা ঐ ভেতরের তেজস্ক্রিয়তার জন্যই। তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ে সৃষ্টি হয় এক শক্তিশালী মৌলিক কণা, সেই কণার অবক্ষয় উন্মুক্ত করে আর একটি স্থান-মাত্রার যার মাধ্যমে আহরণ করা যায় মহাবিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শক্তি, সেই শক্তি 'খ'-যন্ত্রকে অন্য মহাবিশ্বে নিয়ে যেতে পারে।

ম্যাকিন্টায়ার বলতে থাকে, পীয়ের বা ইসাবেল আপনাকে বাক্স সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলতে পারত। হয়ত তারা বলত, 'খ'-যন্ত্রকে পৃথিবীর ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। 'খ'-যন্ত্র এক সচেতন অস্তিত্ব, তার মাঝে রয়েছে শত মহাবিশ্বের চেতনা। খ-যন্ত্রের মত সংবেদী অস্তিত্ব কোনো মহাবিশ্বেই নেই, সে দেখেছে বহু মহাবিশ্ব, তাদের মধ্যে অসংখ্য তারা, অসংখ্য গ্রহ, বহু ধরণের জীবন, অনেক সচেতন প্রাণী। আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন অস্তিত্বদের অনুভূতি সে গ্রহণ করেছে, বুঝতে চেয়েছে। আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা হল খ-যন্ত্রের বোঝার প্রক্রিয়া। আপনার উপস্থিতি সে অনুভব করেছে, তার চেতনার বিকিরণ নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।

বুঝতে পারি যে স্বপ্নে আমি হিমবাহে বিচরণ করেছি, সেই হিমবাহ আর এক মহাবিশ্বের অথবা এই মহাবিশ্বেরই এক অজানা গ্রহের। সেই গ্রহে 'খ'-যন্ত্র খুঁজছিল মানুষের পদচিহ্ন। আর এক বিশাল লাইব্রেরিতে 'খ'-যন্ত্র পেয়েছিল নতুন বিশ্বের সন্ধান, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না অজানা মহাবিশ্বের বইগুলোর সঙ্কেত। সচেতন বাক্স তার অনুভব ব্যক্ত করেছিল নীলাভ উজ্জ্বলতায় পৃথিবীর মানুষের কাছে, বুঝেছিল সে আমার উপস্থিতি, নিজে যা দেখেছিল আমাকেও তাই দেখাতে চাইছিল। তাই সে'সব স্বপ্ন আমার নিজস্ব ছিল না, ঐ স্বপ্ন ছিল এক যান্ত্রিক বাক্সের, এক আশ্চর্য মহাজাগতিক অভিযানে যে কিনা পেয়েছিল এক নীলাভ জীবন । তার মাঝে ছিল এক নীলাভ শূন্যতা যে শূন্যতায় শক্তি সৃষ্টি হয় অন্য মাত্রার মাধ্যমে। তার চেতনায় আমি হয়েছিলাম রেডিও অপারেটর, সে আমার কাছে চাইছিল সাহায্য। তার বিষুবীয় অরণ্যের কাহিনী বলেছিল আমায়, জানতে চাইছিল দেয়ালের ওপারে কী আছে। সে বলছিল,

Hello?
Is there anybody in there?

Just nod if you can hear me.
Is there anyone at home?

ম্যাকিন্টায়ার গাড়ি থামায় আমার গাড়ির পাশে। আমার তার কাছে আরো অনেক কিছু শোনার ছিল, কিন্তু বুঝেছিলাম এই অভিযানের শেষ হবে এখানেই। ম্যাকিন্টায়ার গাড়ি থেকে নেমে খাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, হালকা বাতাসে তার চুল উড়তে থাকে। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, নিচে অন্ধকারে নদী দেখা যায় না।

আর আপনি? আপনি কী করে ফিরে যাবেন 'ক'-মহাবিশ্বে? জিজ্ঞেস করি। রিটা ম্যাকিন্টায়ার চুপ করে থাকে, তারপর মনে হয় হাসে, আগের মতোই আমি সেই হাসি চোখে দেখি না, কিন্তু সেই হাসির বিষণ্নতা আমার দৃষ্টি এড়ায় না। সে বলে, ফিরে যেতে আমার তাড়া নেই, আ.। ইসাবেল জানে আমি এখানে আছি, আমাদের সভ্যতা যদি সিদ্ধান্ত নেয় কোনোদিন 'ম'-মহাবিশ্বে আসার তাহলে আমার ফিরে যাওয়ার দরকার হবে না। আর এখানে আমার কিছু কাজ এখনো বাকি।

বুঝতে পারি আমার হাতে সময় কম, বুঝতে পারি 'ক'-মহাবিশ্ব আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। রিটা ম্যাকিন্টায়ারের সাথে আমার আর দেখা হবে না। তাকে শেষ প্রশ্ন করি, আপনি কি 'ক'-মহাবিশ্বে এই রকমই দেখতে? ম্যাকিন্টায়ার আমার দিকে তাকায়। তার ঠোঁট, মুখ, চোখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আপনি শেষ পর্যন্ত আসল প্রশ্নটা করলেন, সে বলে। আমার ধারণা ছিল আমি এই রকম দেখতে ছিলাম, কিন্তু এখন তাতে নিঃসন্দেহ নই। বিদায় আ., আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, খুব দরকার পড়লে আপনি আমাকে খুঁজে বের করতে পারবেন, সে বলে। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি তার করমর্দন করি।

অন্ধকারে তার অপসৃয়মান গাড়ির বাতি দেখি, একটা বাঁকে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। 'ক'-মহাবিশ্বও হারিয়ে যায় সেই বাঁকে। সেই রাতে যখন আমি তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালাই, অসংখ্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে যায় আকাশে রাতের জেট প্লেনের পাইলটকে আশ্চর্য করে, তার যাত্রীরাও দেখে সেই আগুন যার আলো তাদের মনে করিয়ে দেয় অনেক প্রাচীন কিংবদন্তির। সেই রাতে আমার কাছে আসে না কোনো প্রাচীন হোপি আদিবাসী তার আগুনের নাচ নিয়ে, পাথরের পাশে উঁকি দেয় না প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি, বুঝি 'খ'-যন্ত্র চলে গেছে গিরিখাত ছেড়ে। দেখা দেয় না কোনো হিমবাহ। আমি বুঝি স্কাইলসের দেহ পাওয়া যাবে না ক্যানিয়ন গহ্বরে। সেই রাতে চাঁদ উঠলে আমি ঢুকে পড়ি তাঁবুতে। সেই রাতে আমি স্বপ্ন দেখি না।

পরদিন আমি রওনা হই দক্ষিণে আরিজোনার ফিনিক্স শহরের দিকে। গাড়ি চলে নাভাহো আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের দেশ দিয়ে, লাল পাথুরে পাহাড়ের পাশে পড়ে থাকে অলঙ্কারের খুদে সব দোকানে, অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকে তাদের দু-একটা ছোট ছোট বাড়ি, আমার মনে পড়ে গাড়ির রেডিওতে সেদিন আবারও ভেসে এসেছিল পিঙ্ক ফ্লয়েড– Hello? Is there anybody in there?

দিন ৭৮৯. সান ফ্রানসিস্কো

অভিযানের শেষ এখানেই, স্বপ্নেরও শেষ। 'ক'-মহাবিশ্বের কাহিনী অনেক সৃজনশীল কল্পনার মতোই পরিচিত অথচ সমস্ত সম্ভাব্য ঘটনার পরিধির বাইরে, যেখানে ইসাবেল, পীয়ের, ম্যাকিন্টায়ার আর স্কাইলসের অস্তিত্ব যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিচ্ছেদে, সেখানে 'ক'-মহাবিশ্ব বাস করে ঠাণ্ডা লড়াই, এফবিআই ও কিউবার এজেন্টদের সাথে। আমার কাহিনী যতীন ছাড়া আর কাউকে বলার ছিল না; কিন্তু সেই কাহিনী আমাকে বদলে দিয়েছিল। এস্কালান্তের গিরিখাত থেকে ফেরার পরে আমি আর ল্যাবে কাজ করতে পারলাম না। টেক্সাসের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে অস্থায়ী কাজ নিয়ে চলে গেলাম হিউস্টনে। সেখানেও বেশি দিন থাকতে পারলাম না, কম্পিউটার কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে গেলাম ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সসিস্কো শহরে। দুবছর কেটে গেল। তারপর যতীনের ই-মেইল এল, পারলে একবার ম্যারিল্যান্ডে এস, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে তোমাকে দেখানোর।

ফোন করলাম। যতীন বলল, তোমাকে এসে দেখতে হবে, জিনিসটা একটু জটিল।

পরের সপ্তাহান্তে প্লেনে করে গেলাম ম্যারিল্যান্ড। গ্রীষ্ম আসছে ম্যারিল্যান্ডে, চারদিকে সবুজের সমারোহ, আমেরিকার পূর্বতীরের মতো সবুজের সমারোহ আমি কোথাও দেখিনি। রাতে খাবার পর যতীন বলতে আরম্ভ করে, তুমি তো লাইরা বা বীণা নক্ষত্রমণ্ডলী চেনো যার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হচ্ছে ভেগা বা অভিজিৎ। অভিজিৎ পৃথিবী থেকে প্রায় ২৫ আলোকবর্ষ দূরে। তুমি হয়ত জানো আশির দশকে নাসা একটা টেলিস্কোপ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, যা কিনা অবলোহিত তরঙ্গে মহাকাশকে পর্যবেক্ষণ করত। এই টেলিস্কোপটি অভিজিৎ নক্ষত্রের চারদিকে একটা গ্যাস ও ধুলোর আবরণ আবিষ্কার করে। এবার বলি আরিসিবোর কথা। পুয়ের্তো রিকোর আরিসিবোয় একটা বিশাল রেডিও টেলিস্কোপ আছে যার অ্যানটেনা একটা মৃত আগ্নেয়গিরির ওপর অবস্থিত। আমার এক বন্ধু জন ম্যাকগিলিভারি সেখানে কাজ করে। আরিসিবো টেলিস্কোপ গ্রীষ্মের মাসগুলোয় অনেক সময়ই বীণার তারাদের অবলোকন করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা পালসার বা ঘুরন্ত নিউট্রন নক্ষত্র আবিষ্কার করবার জন্য। গত মাসে ম্যাকগিলিভারি বীণামণ্ডলের কিছু তারা পর্যবেক্ষণ করছিল, তখন সে সেই মণ্ডল থেকে সে একটা পর্যায়বৃত্ত বা পিরিওডিক সঙ্কেত পায়। সঙ্কেতটা বলতে গেলে অভিজিৎ নক্ষত্রের কাছে থেকেই আসছিল। তার অনুমান সেটা পালসার সঙ্কেত, যে সঙ্কেত সৃষ্টি হয় কোনো নিউট্রন তারার দ্রুত ঘূর্ণনে। এই তারারা হচ্ছে কোনো বিশাল উজ্জ্বল তারার ধ্বংসাবশেষ, ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র হবে খুব ছোট কিন্তু খুব ঘন! কিছু নিউট্রন নক্ষত্র আছে যারা সেকেন্ডে ১০০০ বারের কাছাকাছি ঘোরে। পালসারের চৌম্বকীয় অক্ষ তার ভৌগোলিক অক্ষ থেকে ভিন্ন, সেই চৌম্বকীয় অক্ষের কাছে প্রচুর আলোর বিবরণ হয়, কাজেই ঐ অক্ষ যখন আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে আমরা বিকিরণ বা আলো দেখি। তাই পালসার সঙ্কেতের পুনরাবৃত্তি হয়, এই ক্ষেত্রে ম্যাকগিলিভারি এমন একটা পালসার আবিষ্কার করে যার সিগন্যালের পুনরাবৃত্তি হয় প্রতি এক সেকেন্ডে।

এক সেকেন্ড? আমি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠি। ঠিক এক সেকেন্ড, বলে যতীন আবার। পালসারের পর্যায়বৃত্ত ঠিক এক সেকেন্ড হওয়ার সম্ভাবনাটা যে খুবই কম সেটা আমরা দুজনেই জানতাম। ঠিক এক সেকেন্ড মানে এমন যেন এই পালসারের ঘূর্ণন পৃথিবীর সময়ের এককের সাথে মিল রেখেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যতীন আমাকে একটা কম্পিউটারের ছাপা কাগজ দেখায়। প্রথম পাতায় কিছু জটিল সিগন্যাল, দ্বিতীয় পাতায় শুধু ছয়টা সংখ্যা : ১-২-৫-৯-১৬-১৯। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যতীনের দিকে তাকাই। সে বলে, বুঝতে পারলে না? আমি মাথা নাড়লাম। যতীন বলল, ম্যাকগিলিভারি এই পর্যবেক্ষণটার কোনো অর্থোদ্ধার করতে না পেরে আমাকে ই-মেইল করে। ১ মিলিসেকেন্ড হল ১ সেকেন্ডের সহস্রাংশ। ১০০০ মিলিসেকেন্ডে হলো এক সেকেন্ড। এই পালসারটি ১ মিলিসেকেন্ড ধরে

'অন' বা উজ্জ্বল ছিল, তারপর ১৫৮ মিলি সেকেন্ড 'অফ', অন্ধকার ছিল, তারপর ২ মিলি সেকেন্ড 'অন', ১৫৮ মিলি সেকেন্ড 'অফ', ৫ মিলি সেকেন্ড 'অন', '৫৮ মিলি সেকেন্ড 'অফ', ৯ মিলি সেকেন্ড 'অন' ১৫৮ মিলি সেকেন্ড 'অফ', ১৬ মিলি সেকেন্ড 'অন', ১৫৮ মিলি সেকেন্ড 'অফ' ছিল। সব যদি যোগ করে তবে দেখবে ১০০০ মিলি সেকেন্ড বা পুরো ১ সেকেন্ড হচ্ছে। এই প্যাটার্নটার পুনরাবৃত্তি হয়েছে পুরো এক সপ্তাহ ধরে।

শুধু এক সপ্তাহ? আশ্চর্য হই আবার। হ্যাঁ, ঠিক এক সপ্তাহ, সঠিকভাবে বলতে গেলে ছয় লাখ চার হাজার আটশো সেকেন্ড। কিন্তু তুমি এটা দেখো, এই বলে যতীন কাগজে লেখে–

১+১৫৮+২+১৫৮+৫+১৫৮+৯+১৫৮+১৬+১৫৮+১৯+১৫৮ = ১০০০ মিলি সেকেন্ড = ১ সেকেন্ড

তারপর বলে, এবার ধর, প্রতিটি 'অন' সংখ্যা ইংরেজি বর্ণমালার একটা অক্ষর। যেমন ১ হচ্ছে A, ২ হচ্ছে B, ৫ হচ্ছে E, ৯ হচ্ছে I, ১৬ হচ্ছে S, আর ১৯ হচ্ছে L, সব মিলিয়ে হচ্ছে ABEISL। এভাবে দেখলে এই শব্দটার কোনো মানে নেই; কিন্তু এটা হচ্ছে একটা অ্যানাগ্রাম।

অ্যানাগ্রাম? আমি প্রশ্ন করি এবং প্রায় সাথেই বুঝতে পারি ABEISL-এর মানে কি।

হ্যাঁ, বলে যতীন। এই ABEISL-এর অক্ষরগুলোকে ওলটপালট করে লিখলে হবে। ISABEL।

ইসাবেল! পালসার সঙ্কেত নিতান্তই স্বপ্ন! আমি কিছু বলি না। যতীন বলতে থাকে, এই পালসার সঙ্কেত ঠিক এক সপ্তাহ ধরে টেলিস্কোপে ধরা পড়ে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। এক সপ্তাহ মানে একটা সপ্তাহই, একেবারে সেকেন্ড মিলিয়ে ৭ দিন। আর পালসার সঙ্কেতটা এক সেকেন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তুমি জানো সেকেন্ডের সময়সীমাটা মানুষেরই সৃষ্টি, তাই এই সঙ্কেত যে পাঠিয়েছে সে পৃথিবীর সময় সম্পর্কে সচেতন।

তুমি কি বলছ যতীন? ইসাবেল পালসার দিয়ে পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠিয়েছে? যতীন মাথা নেড়ে সায় দেয়। যে যতীন এতদিন ইসাবেলের ভাষ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সেই যতীনকেই এক অপার্থিব সঙ্কেতকে মানবকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে 'ক' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে সমর্থন করতে দেখে আশ্চর্য হই।

যতীন আমার বিস্ময় উপলব্ধি করে বলে, কেবল ইসাবেলের পক্ষেই এক সেকেন্ডের

সময়টা নির্ধারণ করা সম্ভব। কোনো পালসারের পক্ষেই এ রকমভাবে শুরু ও শেষ হওয়া সম্ভব নয়। টাইপ-৩ সভ্যতার পক্ষেই একটা পালসারকে এভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তবে শুধু পালসার ব্যবহার করেই যে এই সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। খেয়াল করে দেখো এই সঙ্কেতগুলো জ্যামিতিকভাবে সম্পূর্ণ। এ'রকম চৌকো স্কোয়ার ওয়েভ শুধু যন্ত্র মাধ্যমেই সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে জানবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছুতে ঐ সঙ্কেতের অনেক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু যতীন, আমি বলি, আমার দুটো প্রশ্ন। প্রথমত, তুমি কেমন করে বুঝলে সঙ্কেতটা এসেছে ২৫ আলোকবর্ষ দূর থেকে, আর দ্বিতীয়ত, যদি অভিজিৎ থেকে এই সঙ্কেতটা আসে তবে তা কি আরো ২৫ বছর পরে আসার কথা ছিল না?

ভালো প্রশ্ন, আ.। প্রথমটার উত্তর হচ্ছে পালসারের দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় ডিসপার্সান মেজার নামে এক পদ্ধতি ব্যবহার করে। পালসার থেকে একই সময়ে উদ্ভূত সিগন্যালের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে আসে, এর কারণ আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে খুব কম হলেও কিছু ইলেকট্রন আছে, রেডিও তরঙ্গের বিসরণ হয় সেই ইলেকট্রনে, যার ফলে বড় দৈর্ঘর রেডিও তরঙ্গ ছোট দৈর্ঘর তরঙ্গ থেকে একটু দেরিতে পৃথিবীতে পৌঁছায়। ঐ সময়ের পার্থক্যটুকুই আমাদের বলে দেয় পালসারের দূরত্ব। আমরা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে, পালসার থেকে সঙ্কেত এসেছে তার দূরত্ব ত্রিশ আলোকবর্ষের মধ্যে। কিন্তু ইসাবেল যদি এই সঙ্কেত পাঠায় তবে এত তাড়াতাড়ি সেই সঙ্কেতের পৃথিবীতে পৌঁছুনোর কথা নয়। কিন্তু আ. তোমার মতে 'ক' মহাবিশ্বের বিজ্ঞান সময়কে জয় করেছে। তাদের সঙ্কেত কি আলোর গতিবেগের চাইতে দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে না?

তুমি কি তাই বিশ্বাস কর যতীন? তুমি কি বিশ্বাস কর এই মহাবিশ্বে কোনো কিছু আলোর চাইতে দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে? বিহ্বল হয়ে বলি আমি।

আমি জানি না, আ.। হয়ত এই সঙ্কেত খুব দূর থেকে আসছে না। টাইপ ৩. সভ্যতার পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত শেষাবধি তোমার কাহিনীর সবচেয়ে বড় বিশ্বাসী আমি।

ইসাবেল ক্যারিব সমুদ্রে ভেসে যায়নি, নীলাভ অভিজিতের সঙ্কেত ভেসে এসেছে তার হাত দিয়ে, 'ক'-মহাবিশ্বের মানুষেরা আশ্রয় পেয়েছে ছায়াপথে। তবু যতীনের ব্যাখ্যায় আমি পুরো সন্তুষ্ট হতে পারি না। দুবছর আগের ঘটনা হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। রাতে যতীনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে এসে আমি রাতের আকাশের দিকে তাকাই, গ্রীষ্মের মধ্য আকাশে জ্বলজ্বল করছিল নীল অভিজিৎ। দুদিন পরে ক্যালিফোর্নিয়া ফেরার সময় প্লেন উড়ে গেল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে। আমি চেষ্টা করি আরো উত্তরে এস্কালান্তে

নদীর গিরিখাত দেখতে, 'ক'-মহাবিশ্বের মতোই তা পড়ে থাকে আমার দৃষ্টির বাইরে।

পরিশিষ্ট

ঢাকা

আরণ্যকের দিনপঞ্জির শেষ এখানেই। ডাইরিটা আমাকে দেয়ার পর আ.র সাথে আমেরিকায় আর দেখা হয়নি, কেউ তার খোঁজও দিতে পারেনি। এরপর আমি ফিরে আসি ঢাকায়। আ.র কাহিনী আমাকে বিস্মিত করেছে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব যেমন আমাকে বিস্মিত করে। তবু ঢাকার দৈনন্দিন জীবনের হৈ-হট্টগোলে সেই বিস্ময়ও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে, কেবল আমার মনে থাকে আ.কে কথা দিয়েছিলাম লেখাটা ছাপানোর চেষ্টা করব। শেষাবধি, বছর দুই পরে, দিনপঞ্জিটা ঢাকার এক প্রকাশনা সংস্থা ছাপাতে রাজি হয়। লেখাটার নাম দিই 'অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো', হয়ত আ. এখনো আশা করছে অভিজিৎ থেকে তার জন্য সঙ্কেত আসবে। আমি লেখাটা এডিট করে দিই, পরে তারা আমাকে প্রুফ দেখতে দেয়। প্রুফের প্যাকেট নিয়ে এক বর্ষার অপরাহ্নে বাংলাবাজারে আমার সঙ্গে দেখা হয় আরণ্যকের, একটা বইয়ের দোকানে। ছোট দোকান, বাইরের বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচতে আমরা দুজনেই অল্প একটু জায়গায় গাদাগাদি ভিড় করেছিলাম।

আপনার নাম কি অনীক চৌধুরী? আমার স্বর ছিল খুব মৃদু, এমন করে তার সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা সীমিত, আমার ইতস্তত ভাবও এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, আ. ঘুরে আমার দিকে তাকায়, তবে প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারে না। আপনি কি আমেরিকায় ছিলেন? প্রশ্ন করি আমি দ্রুত, যেন এই তুমুল বর্ষা সত্ত্বেও আ. আমাকে না চিনে বৃষ্টি মাথায় করে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আ. পালিয়ে যায় না, তার হাতের ছাতাটা গুটিয়ে রেখে বলে, ছিলাম। তারপরে বলে, আপনাকে চিনতে পারছি না। আমি পরিচয়

দিলাম, আপনার সঙ্গে আমার ক্যালিফোর্নিয়ায় দেখা হয়েছিল। আমরা দুজনে এক সাথে পাহাড়ে যেতাম।

আ.র চোখে বহুদিন আগে দেখা ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে। সেই চোখ যেন বলে, আমি দেখেছি যা তা তোমরা মানুষেরা কল্পনাও করতে পারবে না। কেমন আছেন আপনি? সে জিজ্ঞেস করে। আমি ভালোই আছি, বলি আমি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার লেখাটা শিগগিরই ছাপাচ্ছি। আমার কণ্ঠে চাপা উল্লাস।

লক্ষ করি আ.র চোখ থেকে পরিচিত উজ্জ্বলতা চলে যাচ্ছে। সে প্রশ্ন করে, আমার লেখা বলছেন? কি লেখা?

আপনার দিনপঞ্জিটার কথা বলছি আমি, যেটা আমাকে দিয়েছিলেন, আমি ব্যাগ থেকে বইয়ের প্রুফটা বের করতে করতে বলি। আ. আশ্চর্য হয়ে ছাপা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলি, আপনার মনে নেই আ.? আপনি আমাকে এই লেখাটা ছাপাতে বলেছিলেন!

বৃষ্টির দুপুরে আ. তার লেখা চিনতে পারে না। আমার পীয়েরের কথা মনে পড়ে, আ.র অভিযান কি সত্যি শেষ হয়ে গেছে? একটা রিকশা করে আ.কে নিয়ে যাই লক্ষ্মীবাজারে এক পরিচিত মোগলাইয়ের দোকানে। সন্ধ্যায় তার লঞ্চ ধরতে হবে সদরঘাট থেকে, সে যাচ্ছে বরিশাল। সেই বৃষ্টির দিনে রাস্তায় লোক ছিল না, জল উঠছিল দুপাশ ধরে, দেখা যাচ্ছিল না বিদ্যুতের রেখা, তবে বজ্রপাতের শব্দে মনে হচ্ছিল ভেঙে পড়বে পুরোনো সব ঘরবাড়ি। তীব্র বৃষ্টিতে ভিড় ছিল না মোগলাই রেস্তোরাঁয়।

পরবর্তী দুই ঘণ্টা আ. খুব মনোযোগের সঙ্গে তার লেখা পড়ে। চেষ্টা করি তার চোখের ভাষা পড়তে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝি তার চোখ জ্বলে ওঠে না পরিচিত দিকচিহ্ন দেখে। আমি চেষ্টা করি আ.র সেই অ্যাডভেঞ্চারের সত্তাকে আবিষ্কার করতে, কিন্তু ভাদ্রের বন্যায় আ.র মন পড়ে থাকে বরিশালের বাড়িতে, যেখানে স্ত্রী ও ছোট মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় আছে। আমার মনে এস্কালান্তের লাল গিরিখাতে হাঁটে আ., অতর্কিত বন্যায় হারিয়ে যায় 'খ'-যন্ত্র, আমার মনে আ. বাস করে মহাজাগতিক সময়ে। আ. দোকানের বাইরে আলোর দিকে তাকায়, তার দৃষ্টিতে থাকে দূরের আবছা স্মৃতিকে ধরার প্রচেষ্টা। পড়া শেষ হলে সে দুহাত দিয়ে কিছুক্ষণ মাথা চেপে বসে থাকে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি এসবের কিছুই মনে করতে পারছি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, জিজ্ঞেস করি, আপনার ম্যারিল্যান্ডের কথা মনে আছে?

আমার ম্যারিল্যান্ডে ল্যাবের কথা মনে আছে, বলে আ., যতীনের সাথে আমি কাজ করতাম, আমার হিউস্টনের কথা মনে আছে, সান ফ্রান্সিসকোর কথা। আর ইসাবেল? নিজেকে প্রশ্ন করে আ.। না, ইসাবেল বা পীয়ের বা ম্যাকিন্টায়ার কাউকে আমার মনে নেই। আমি কবে দিনপঞ্জি লিখেছিলাম?

অনেক বছর হয়ে গেল, বলি আমি, আপনার নিজের হাতে লেখা ডায়েরি। আমার সাথে নেই, কিন্তু আপনাকে পরে দেখাতে পারি, বলি। আমার হাতে সময় বেশি ছিল না, আ.র লঞ্চের সময় এগিয়ে আসছিল, বাইরে বৃষ্টি ধরে আসে।

আ র এফবিআই? স্কাইলস? না, বলে আ. আবার। যতীনের সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই? আ.র অপসৃয়মান স্মৃতির কোণে 'ক'-মহাবিশ্বের ভাসমান কণাটুকু থাকলে তার আভাস আমি চাইছিলাম। কিন্তু আ. তার পুরোনো জীবন সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না।

আ.কে আমার বলবার আর কিছু ছিল না। সে বাইরে তাকিয়ে ছিল বৃষ্টি পুরোপুরি থামার অপেক্ষায়, হয়ত তার মন ভুলে যেতে চাইছিল পুরোনো অ্যাডভেঞ্চার, যেই অ্যাডভেঞ্চারের কোনো মূল্য নেই তার এই জীবনে। মাটির জগৎ থেকে তাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে এলাম না, আমরা নীরবে বসে রইলাম। বৃষ্টি থেমে গেলে আমি তাকে সদরঘাটে রাতের লঞ্চে তুলে দিতে গেলাম। জেটি থেকে লঞ্চে ওঠার সময় আ. আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, একটা কথা মনে পড়েছে। আমার কাছে একটা খুবই ছোট ধাতব নীল বাক্স আছে। বাক্সটা কোনখান থেকে এসেছে তা বলতে পারব না। তার ভেতরে কিছু নেই, কিন্তু ওপরে একটা অদ্ভুত চিহ্ন আছে, সোনালী রঙের। আমার বইয়ের তাকে রেখে দিয়েছি। এইটুকু বলে আ. লঞ্চে উঠে গেল। সকালে সে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। তার রাতের লঞ্চ অন্ধকার বুড়িগঙ্গায় আরো অনেক টিমটিমে আলোর নৌযানের মধ্যে হারিয়ে যায়।

লঞ্চ টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ, পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলে, ওপরের আকাশে অনেক ধোঁয়ার মধ্যেও ফুটে ওঠে তিনটি তারার ত্রিকোণ—অভিজিৎ, আল্টেয়ার ও দেনেব। সেই টার্মিনালের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় শ'য়ে শ'য়ে লোক, রাতের আঁধারের পর তারা পৌঁছে যাবে আলোর দেশে, অন্তত তাই তাদের আশা। রাতে বৃষ্টি পড়ে আরো নিবিড়ভাবে, আমার নারিন্দার ছোট ঘরের বাইরে রাস্তায় জল জমে একাকার, আমি দোতলার বারান্দা থেকে নিচে জলের স্রোত দেখি, জলার কণা হয়ে আমি কল্পনা করি বঙ্গোপসাগরের তলদেশ, ভারত মহাসাগরের নিচে টেকটনিক সঞ্চালন। রাতে আমি পড়ি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আগুন, উপন্যাসের মুখ্য অভিনেতা যাযাবর নরেশ

বলে, জানালাটা ছিটকিনি আঁটিয়া বন্ধ করিবার সংকল্প নিয়া উঠিলাম। খোলা জানালাটা দিয়া চোখে পড়িল, শহরের ধোঁয়া ও আলোর আবরণের নৈশ আকাশে অস্পষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের তপস্যার মতো কত অসংখ্য নক্ষত্র যে আলোকের বার্তা পৃথিবীর বুকে পাঠাইয়াছে সে আলোক ঐ আলোকিত ধূমচন্দ্রাতপের আড়ালে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু পশ্চিম-গগন প্রান্তে ঐ চন্দ্রাতপ বিদীর্ণ করিয়াও ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—ভেনাস, শুকতারা। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ময়, ঈষৎ নীলাভ জ্যোতি। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কক্ষ, মনের ছায়াপট যেন কায়া গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

ঘড়িতে দেখলাম রাত বারোটা বাজল, আরণ্যকের লঞ্চ ততক্ষণে নিশ্চয়ই মাঝপথে পৌঁছে গেছে। বিদ্যুৎ চলে যায়, একটা মোমবাতি জ্বালাই। বাতির কম্পমান আলোয় আমি ভাবি আ.র স্মৃতি কোথায় হারিয়ে গেল। সেই স্মৃতি বিস্মৃত আরণ্যকের মনে, কিন্তু আমার মনের ছায়াপটে সেটা মূর্ত হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে আমার মনে একটা কাহিনীর ছক ভেসে আসে, সেই ছকের সময়সীমা ছিল আ.র আমেরিকা বাসের শেষ সময়ের। ছকে আ. কাজ করে সান ফ্রানসিস্কো শহরের এক সফটওয়্যার কোম্পানিতে। চেষ্টা করি তার জীবনটা আমার মানসপটে সৃষ্টি করতে।

সান ফ্রানসিস্কো

এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করে আ.র মনে, সান ফ্রানসিস্কোর কুয়াশায় সেই অস্থিরতা ঢেকে যায় না, দৈনন্দিন কাজের যৌক্তিকতা খুঁজতে সময় যায়। কাজের শেষে গোল্ডেন গেট পার্কে যায় সে, নতুন ডালিয়া ও অর্কিডের সমারোহে হাঁটে, অন্ধকার হয়ে আসলে নক্ষত্র খোঁজে আকাশে, আকাশ উজ্জ্বল হয়ে থাকে শহরের আলোয়। সংসাদপত্রে যুদ্ধের খবর সে পড়ে না, পড়ে না স্টক মার্কেটের উত্থান, আ. খোঁজ করে ইউ.এফ.ও.র। পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমত্তা খোঁজে সে, ইন্টারনেটে খোঁজ করে Search for Extraterrestrial Intelligence প্রোগ্রামের ফলাফল। কিন্তু মহাকাশ থেকে সচেতন অস্তিত্ব সঙ্কেত পাঠায় না, অভিজিৎ নক্ষত্র দীপ্তমান কিন্তু নীরব থাকে তার নীলাভ আলোয়। নিকটবর্তী পাহাড়ে ভ্রমণ করে আ., শীতে, গ্রীষ্মে, শহর থেকে দূরে থাকে, তারপর আবার শহরে ফিরে আসে মহাবিশ্বের আশায়। কিন্তু 'ক'র কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ইসাবেলের কথা ভুলে যায় না আ., তবে সে ভুলে যায় ইসাবেলের মুখ। অবশেষে এক কুয়াশার ভোরে সে ফোন করে ওয়াশিংটন, হ্যালো, আমি কি অফিসার ফ্রেড কম্পটনের

সঙ্গে কথা বলতে পারি। ফ্রেড কম্পটন উত্তর দেয় আড়াই হাজার মাইল দূর থেকে।

আমার নাম আ.। প্রায় চার বছর আগে আমি পীয়ের লাবন্তিয়ে নামে একজনের দুর্ঘটনার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, বলে আ.। হ্যাঁ, আপনার কথা মনে আছে, বলে কম্পটন। শুনুন, আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে, অনুরোধ করে আ., আপনার কি জেরার্ড স্কাইলস ও রিটা ম্যাকিন্টায়ার নামে দুজন এফবিআই এজেন্টের কথা মনে আছে? তারা আমাকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

একটু সময় নেয় কম্পটন, তারপর বলে, হ্যাঁ, আমার তাদের কথা খেয়াল আছে। শুনুন, আ. বলে, আপনি কি রিটা ম্যাকিন্টায়ারের খোঁজ করতে পারবেন? তাকে আমার কিছু জরুরি সংবাদ দেয়ার ছিল। আমি আপনাকে আমার ফোন নম্বর দিচ্ছি। আপনি যদি ম্যাকিন্টায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তাকে বলবেন অবশ্যই যেন সে আমার সাথে যোগাযোগ করে।

নম্বরটা দিয়ে ফোন ছেড়ে দেয় আ.। এবার অপেক্ষার পালা। সমুদ্র পরিভ্রমণ শেষে ডাঙা-প্রত্যাশী নাবিকের মতো প্রতিটা দিন কাটে তার। এক সপ্তাহের মধ্যে ফোনটা আসে, লাইনের অপর প্রান্তে নারী কণ্ঠ চিনতে পারে না সে। আমি রিটা ম্যাকিন্টায়ার, বলে সেই কণ্ঠ। আ. র হৃৎপিণ্ড দ্রুত কাজ করে, রিটা কেমন আছেন আপনি? মনে হয় এক পরিচিত হাসি ভেসে আসে লাইনে, ভালো, আর আপনি?

উত্তরটা দিতে দেরি হয় আ.র। কি চায় সে ম্যাকিন্টায়ারের কাছ থেকে? সে বলে আমি ভালো নেই, আমি আবার স্বপ্ন দেখতে চাই।

কয়েকদিন পরে ম্যাকিন্টায়ার সান ফ্রানসিস্কো আসে প্লেনে করে। আর এক কুয়াশার দিনে আ. তার জন্য অপেক্ষা করে নির্জন পয়েন্ট রেইসের সমুদ্রতীরে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটে সে, বাঁদিকে কুয়াশা ঢেকে রাখে সমুদ্র, ঢেউ ভাঙার শব্দে নির্জনতা হয়ে ওঠে আরো নিবিড়। তার ডান পাশে ছিল পাহাড়, উঁচু রেডউড গাছের বন, কিন্তু সেদিন তার দৃষ্টিসীমা মাত্র কয়েক হাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবু আ. জানতো সেই কুহেলিকার অস্পষ্টতায় রিটা তাকে খুঁজে বের করতে পারবে।

আ.! অনেক দূর থেকে মনে হয় ভেসে আসে সেই ডাক। তারপরই কুয়াশা ভেদ করে হঠাৎ তার সামনে আবির্ভূত হয় কালো ওয়ারকোট পরা এক নারী। ইসাবেল? হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে আ.র, কিন্তু তার চোখে পড়ে ওভারকোটের দু'কাঁধে ছড়ানো খয়েরি বাদামি চুল।

ইসাবেলের চুল ছিল গাঢ় কালো, আর ম্যাকিন্টায়ারের উজ্জ্বল সোনালি। রঙ্গে কি আসে যায়, সে ভাবে চুলের রঙ তো সবাই বদলাতে পারে! তবু সেই কুজ্ঝটিকায় ম্যাকিন্টায়ারকে ভালো করে চিনতে পারে না আ.। রিটা বলে, আমাকে চিনতে পারছেন না আ.?

চিনতে সত্যিই পারে না আ., দূর থেকে সে দেখতে পায় না ম্যাকিন্টায়ারের উন্নত চিবুক, নীল উজ্জ্বল চোখের মণি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রিটা, কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ যেন তার শরীরী মূর্তিগ্রহণ কোনো অদৃশ্য মাধ্যম থেকে। ইসাবেল বা ম্যাকিন্টায়ার— দুজনকেই খুব অল্প সময় দেখেছে আ., চার বছর পরে তাদের মুখকে স্মৃতিতে খুঁজে পায় না সে। সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসে, না দেখা গাঙচিল ওড়ে আকাশে, তাদের কলরব নস্টালজিয়ায় মুহ্যমান করে দেয় আ. কে। কিসের নস্টালজিয়া ভাবে সে। তুষার ঝড়ের ইসাবেল না লাল গিরিখাতের ম্যাকিন্টায়ার? তার ভাবনা ভেঙে দিয়ে ম্যাকিন্টায়ার (নাকি সে ম্যাকিন্টায়ার নয়!) বলে, আপনাকে আমার একটা জিনিস দেয়ার ছিল। তারপর সে হাত বাড়িয়ে দেয় আ.র দিকে, তার উন্মুক্ত তালুতে থাকে একটা ছোট খেলনার মতো বাক্স, জ্বলছিল বাক্স নীল রঙে। তার ওপর সোনালী চিহ্ন, 'ক' মহাবিশ্বের।

এই বাক্সের মধ্যেই কি সব সমাধান? এই প্রথম কথা বলে আ.। সেটা আপনি বলতে পারবেন, এই বলে হাসে নতুন রিটা। হঠাৎ আ. বোঝে ইসাবেল, ম্যাকিন্টায়ার আর এই নতুন ম্যাকিন্টায়ার—সবার হাসিই এক রকম। আর অভিজিৎ থেকে সঙ্কেত? প্রশ্ন করে সে। অভিজিৎ থেকে সঙ্কেত তাহলে আপনি পেয়েছেন? পাল্টা প্রশ্ন করে রিটা। মাথা নেড়ে সায় দেয় আ.। তাহলে নতুন আর কোনো সঙ্কেতের প্রয়োজন হবে না, বলে রিটা, আপনার এখন পথ বেছে নেয়ার সময় হয়েছে।

পথ? কোন পথ? সম্মোহিতের মতো কথা বলে আ.। আপনার হাতে তার উত্তর আছে, বলে রিটা, এবার আমার যেতে হবে। বিদায়., আমাকে আপনার আর প্রয়োজন হবে না। এই বলে রিটা হঠাৎই যেন আবার কুয়াশায় মিশে যায় আ.কে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে। সে যেন শুধু এক পা পিছিয়ে যায়, সাথে সাথে কুয়াশা তাকে ঢেকে দেয়, ডুবে যায় সে এক কুয়াশার সমুদ্রে। গাঙচিল আর ঢেউয়ের শব্দ ঘন হয়ে আসে, আ. এই যবনিকাপাত আশা করেনি, তবু তার হাতের উজ্জ্বল বাক্স তকে এক অসহায়তা থেকে রক্ষা করে। ঐ দিন সে হাঁটে আকাশচুম্বী লাল বৃক্ষের বনে যেই বনে সূর্যের আলো ঢোকে না। বায়ুমণ্ডলের বাতাস উঁচু গাছের ডাল কাঁপিয়ে বয়ে যায় ঝড়ের শব্দে। সেই রাতে আ. ঘুমিয়ে পড়ে ছোট বাক্সটা মাথার কাছে রেখে। রাতে সে স্বপ্ন দেখে শত মহাবিশ্বের, বিষুবীয় বনের, মরুভূমি, হিমবাহ ও লাইব্রেরির। সকালে যখন ঘুম ভাঙে সে দেখে তার মাথার কাছে

একটা ছোট নীল রঙের সাধারণ বাক্স, সে বুঝতে পারে না কেমন করে বাক্সটা এসেছে ঘরের মধ্যে। বাক্সর ওপর এক চিহ্ন সোনালী হয়ে জ্বলে। বাক্সটা খুলে ভেতরে কিছু খুঁজে পায় না আ., কোনো একটা স্মৃতি তাঁর মনের কোণ ঘেঁষে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাক, সে বলে। বাইরে বারান্দায় সে যখন এসে দাঁড়ায় হেমন্তের সকাল উজ্জ্বল করে রেখেছিল সামনের ছোট পার্ক।

ঢাকা

সকালের রোদ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, বারান্দায় বেরিয়ে দেখি রাস্তার জল নেমে গেছে, নিচের পথচারীরা চলেছে নতুন সম্ভাবনার আশা নিয়ে। এই শহরে মনকে শান্ত করতে পারে এমন স্থাপত্য আমি দেখতে চাই। শুধু দেখি শুধু বসতি ঘন করার অভিযান। আমি দেখতে চাই শহরের দিগন্ত, কিন্তু খাপছাড়া নতুন অসুন্দর বাড়ি দৃষ্টি রোধ করে রাখে। বিকেলে আমি যাই বাংলাবাজারে রুমি ভাইয়ের অফিসে, রুমি ভাই আ.র দিনপঞ্জিটা ছাপানোর ব্যবস্থা করছিলেন।

আমার সঙ্গে আ.র দেখা হয়েছে, আমি বলি, কিন্তু আ. তার দিনপঞ্জিকে মনে রাখেনি। রুমি ভাই যেন আশ্চর্য হলেন না, শুধু বললেন, তাহলে রহস্যজনক আ.র দেখা পাওয়া গেল। এবার আমি অবাক হয়ে রুমি ভাইয়ের দিকে তাকালাম, এতদিন কি উনি আমাকে বিশ্বাস করেননি, উনি কী ভেবেছেন সেই দিনপঞ্জি আমার লেখা? আমি বললাম, আপনাকে আগে বলি নি, রুমি ভাই, আমার এক জ্যোতির্বিদ বন্ধু আছে, তাকে আরিসিবো বেতারতরঙ্গের দূরবীনে সত্যিই এক সেকেন্ডের পালসার আবিষ্কৃত হয়েছিল কিনা খোঁজ নিতে বলেছিলাম। সে খোঁজ নিয়েছিল। যে সপ্তাহের কথা যতীন আ.কে বলেছিল সেই এক সপ্তাহের খতিয়ান নাকি আরিসিবোর কম্পিউটারে নেই। সমস্ত আকাশের তথ্য যে নেই তা নয়, শুধুমাত্র লাইরা বা বীণা তারামণ্ডলের কোনো ডাটা নেই। রুমি ভাই গভীর বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, রিটা ম্যাকিন্টায়ার সেই তথ্য মুছে দিয়েছে?

হতে পারে, বলে আমি সায় দিই। আ.র কাহিনির সঙ্গে এটাই ছিল আমার একমাত্র পার্থিব যোগাযোগ। আরিসিবোর ডাটায় কোনো আশ্চর্যজনক তথ্য ছিল, হয়ত যতীনের বন্ধু ম্যাকগিলিভারিকে পেলে কম্পিউটারের ফাইলগুলোর কী হয়েছে বলতে পারত। কিন্তু তাকে আমার জ্যোতির্বিদ বন্ধু খুঁজে পায় নি।

রুমি ভাই হাসলেন, বললেন, মহাবিশ্বের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব সবকিছুকে নিশ্চিতভাবে বুঝতে দেয় না, এটাও এক মহাজাগতিক ষড়যন্ত্র। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, অমল, তোমার কী মনে হয়? আ.র কি স্মৃতিভ্রম হয়েছে? স্মৃতিভ্রম? না না, আমি বলে উঠি, আমার মনে হয় নিজের স্মৃতির ওপর আ.র কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেটা ঠিক স্মৃতিভ্রম নয়। নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলছ? মন্তব্য করেন রুমি ভাই, তাঁর চোখে পরিহাসের ঝলক। তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোক আমি কম দেখেছি। শুনুন রুমি ভাই, আমি বলি, আ.র সঙ্গে রিটা ম্যাকিন্টায়ারের আর একবার দেখা হয়েছিল। আ.কি সেটা তোমাকে বলেছে? প্রশ্ন করলেন রুমি ভাই। না, আমি বলি।

তাহলে আমি জানি তুমি কী বলবে? রুমি ভাই বললেন। তুমি বলবে রিটা ম্যাকিন্টায়ার আ.র স্মৃতি মুছে দিয়েছে।

আমি হেসে উঠলাম, রুমি ভাই আপনি সর্বজ্ঞ, না বললেও বুঝতে পারেন। কিন্তু এমন হতে পারে ইসাবেল আর রিটা ম্যাকিন্টায়ার একই ব্যক্তি। আ.র অবচেতন মন যেন এটা বুঝেছিল, তাই, অনেকটা নিজের অজান্তেই, সে রিটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। রুমি ভাই হাসেন, বলেন, সেটা হতে পারে। 'ক' মহাবিশ্বের অস্তিত্বরা আসলেই দেখতে কেমন তা তো আমরা জানি না। এমন হতে পারে তারা এক সম্মিলিত অস্তিত্বে বাস করে, শুধু পৃথিবীর মানুষের শর্ত পূর্ণ করতে আলাদা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

জিনিসটা এতই জটিল যে তা নিয়ে ভাবতে চাইলাম না। মহাবিশ্বের অসীম সম্ভাব্যতার মধ্যে এটাও একটা সম্ভাবনা। রুমি ভাই বলেন, আমি আর একটা ব্যাপার ভাবছিলাম, তোমার সাথে আ.র অদ্ভুত ব্যবহারের আর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। তোমার যদি হাতে কিছু সময় থাকে তো বলি। বললাম, অবশ্যই সময় আছে।

রুমি ভাই বলতে শুরু করলেন, অনেক দিন ধরে আমি একটা লেখা খুঁজছিলাম, হোর্হে লুই বোর্হেসের ঈশ্বরের হস্তাক্ষর। অবশেষে সেদিন নিউ মার্কেটে বোর্হেসের গল্পসমগ্র খুঁজে পেলাম। বোর্হেস সেই গল্পে লিখছেন এক মেক্সিকান ইন্ডিয়ানের কথা, যাকে কিনা স্প্যানিশ কনকিস্তাদররা আটকে রেখেছিল মাটির নিচে এক অন্ধকূপে। তার নাম ছিল জিনাকান, সে ছিল কাহালোম পিরামিডের প্রধান পুরোহিত। অন্ধকূপের আর একটা ঘরে ছিল একটা বাঘ, বোর্হেস বলছেন সেটা ছিল একটা জাগুয়ার। সেই জাগুয়ারকে জিনাকান সব সময় দেখতে পেত না, শুধু যখন দুপুরের খাবার দেয়ার জন্য ছাদের একটা ছোট দরজা খোলা হতো, তখন মধ্যাহ্নের আলোয় জাগুয়ারটাকে দেখা যেত।

এভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। সেই বছরগুলোয় জিনাকান তার নিঃসঙ্গতায় ধীরে ধীরে এক নতুন বোধের সম্মুখীন হয়, তার মনে হয় সৃষ্টির প্রথম সন্ধিক্ষণে ঈশ্বর ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক অলৌকিক বাক্য রেখে গেছেন, ঐ বার্তা লুকিয়ে রাখা ছিল যাতে অদৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে তা পৌঁছে যেতে পারে সবচেয়ে দূরবর্তী প্রজন্মের কাছে। শুধু একজন নির্বাচিত বিশেষ ব্যক্তি সেই দৈবিক শব্দগুচ্ছের অর্থোদ্ধার করতে পারবে। কারারুদ্ধ অবস্থাতেও জিনাকানের ধারণা হয় সে উদ্ধার করতে পারবে ঈশ্বরের সেই বার্তা।

জিনাকানের মনে হয় ঐ বাক্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার কারাসঙ্গী জাগুয়ারের হলুদ চামড়ার কালো ছোপে। অবশেষে সে বুঝতে পারে মহাবিশ্বের গোপন ছক, সে আবিষ্কার করে জাগুয়ারের গায়ে লেখা চৌদ্দটা শব্দ, যার উচ্চারণে অদৃশ্য হবে তার পাথরের কারাগার। সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করলে জিনাকার হবে সর্বশক্তিমান, অমর। ফিরে পাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া দিন, ধ্বংস করতে পারবে সে তার স্প্যানিশ অত্যাচারীদের, তৈরি করতে পারবে সে তার পিরামিড। চল্লিশটা শব্দমাত্রা, চৌদ্দটা শব্দ উচ্চারণ করলে জিনাকান পাবে মেক্সিকোর রাজত্ব।

কিন্তু জিনাকান শব্দগুলো উচ্চারণ করে না, কারণ ততদিনে জিনাকান মহাবিশ্বের ছক দেখেছে, জিনাকানের কাছে মানুষের তুচ্ছ আশা, নিরাশা বা দুর্যোগের আর মূল্য নেই, তার কাছে মানুষের দেশ ও জাতির কোনো অর্থ নেই, কারণ সে আজ আর কেউ নয়। তাই সে দৈবিক বাণী জানা সত্ত্বেও তা উচ্চারণ করে না, সে শুয়ে থাকে তার অন্ধকার কারাগারে, পাথরের মেঝেতে।

আমি আশ্চর্য হয়ে রুমি ভাইয়ের গল্প শুনি। রুমি ভাই টেবিল থেকে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ান, জানালার ওপাশে অন্য বাড়ির দেয়াল। দেয়ালের মধ্য দিয়ে রুমি ভাই যেন দেখতে চান ঐ পাশের জগৎ। রুমি ভাইয়ের বাবা-মা তার নাম রেখেছিলেন সুফি কবি জালালউদ্দিন রুমির নামে, রুমি ভাই সেই নামের সার্থকতা বজায় রেখে দৈনন্দিন ঘটনায় অপার্থিব ইঙ্গিত খোঁজেন। তারপর দেয়াল থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, অমল, আ. হচ্ছে আমাদের নতুন জিনাকান। সে মহাকালের রূপ দেখেছে, তার কাছে ঐ দিনপঞ্জিরও কোনো মূল্য নেই। সে যেন 'ক' মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে।

সেই সন্ধ্যায় রুমি ভাইয়ের অফিসের বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল। রুমি ভাইয়ের ব্যাখ্যা আমি মেনে নিতে পারি নি। ভাবি নীল বাক্সের শীতলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা আ.র পক্ষে এত সহজ হবে না, ইসাবেলের কাহিনীকে সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। সেদিনের

ঢাকার আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তার পেছনে মহাবিশ্বের বাদবাকি অংশ পড়ে থাকে, অদৃশ্য থাকে অভিজিৎ। রাতে আমি যখন রিকশাতে বাড়ি ফিরি তখন পাড়ার দোকানের রেডিওতে বাজছিল লালনের গান।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে,
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
এক পড়শি বসত করে॥
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
কিনারা নাই তরণি পারে, মনে করি
দেখব তারিই, আমি কেমনে সেথা যাই রে॥

ভাবি, অভিজিৎ তারার কাছে ইসাবেলরা বাসা বেঁধেছে, কিন্তু সেখান যাবার আমাদের কোনো উপায় নেই। যখন শুতে যাই তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ মেঘমুক্ত, অভিজিৎ জ্বলজ্বল করছে। রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম এক অপার্থিব নীল রঙের বাক্সর। সমুদ্রতীরের কুয়াশায় রিটা ম্যাকিন্টায়ারের হারিয়ে যাওয়া। হয়ত দেখেছিলাম 'ক' মহাবিশ্বের সোনালী চিহ্নটি, আরো অনেক কিছু দেখেছিলাম, কিন্তু সেগুলো আর মনে নেই।